উত্তম কৃষি চর্চা এবং নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য আমের আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল

নিরাপদ ফল ও সবজির উৎপাদন এবং তাদের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ স্কিম

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১

উত্তম কৃষি চর্চা এবং নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য আমের আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল

রচনা ও গবেষণায়

ড. মো. মসিউর রহমান
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, বিএআরআই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এবং
কর্মসূচি পরিচালক, নিরাপদ ফল ও সবজির উৎপাদন এবং তাদের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ স্কিম

ড. মো. শরফ উদ্দিন
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ, এইচআরসি, বিএআরআই, গাজীপুর

ড. এ কে এম মাহবুব উর রহমান
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএইচআরএস, বিএআরআই, শিবপুর, নরসিংদী

ড. এম এইচ এম বোরহান উদ্দিন ভূঁইয়া
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সিআরএস, বিএআরআই, জৈন্তাপুর, সিলেট

ড. নাছরীন জাহান
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর

কাজী ছাইদুর রহমান
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি পরিসংখ্যান এবং আইসিটি বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর

সংকলন ও সম্পাদনায়

ড. দেবাশীষ সরকার
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

ড. মো. শরফ উদ্দিন
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর

ড. মো. মসিউর রহমান
কর্মসূচি পরিচালক, নিরাপদ ফল ও সবজির উৎপাদন এবং তাদের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ স্কিম

প্রকাশকাল : জুন ২০২২

মুদ্রণ সংখ্যা : ১৫০০ কপি

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১

স্বত্ব সংরক্ষিত : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১

অর্থায়নে : নিরাপদ ফল ও সবজির উৎপাদন এবং তাদের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ স্কিম
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১

মুদ্রণে: সৌরভ মিডিয়া প্রোডাক্টস
১৮, বাবুপুরা, কাঁটাবন ঢাল, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, মোবাইল: ০১৭১৮৪১৯০০১

চিত্রঃ বারি আম-২ এর ফলবান গাছ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা	৫
২	উত্তম কৃষি চর্চা	৭
৩	আমের বাণিজ্যিক ও রপ্তানিযোগ্য জাতসমূহ	৮
৪	আমের আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল	১১
৫	বংশবিস্তার ও চারা কলম উৎপাদন	১৮
৬	আমের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় ও তাদের দমন ব্যবস্থাপনা	২৩
৭	আমের প্রধান রোগ-বালাই ও তাদের দমন ব্যবস্থাপনা	৩০
৮	আমের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় সমস্যা এবং ব্যবস্থাপনা	৩৫
৯	আমের মাঠ পর্যায়ে বিরাজমান কিছু সমস্যা ও এর সমাধান	৩৮
১০	বালাইনাশক ব্যবহারের নীতিমালা ও আবশ্যিক বিষয়সমূহ	৪২
১১	গুণগত মানসম্পন্ন আম উৎপাদনে কতিপয় আধুনিক প্রযুক্তি	৪৪
১২	আমের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণ	৫১
১৩	রাইপেনিং চেম্বারে আম পাকানো পদ্ধতি: প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়	৫৬
১৪	আমের প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা	৫৯
১৫	আম রপ্তানির সম্ভাবনা ও করণীয়	৬৩
১৬	সহায়ক গ্রন্থসমূহ ও প্রকাশনা	৬৪

চিত্রঃ বারি আম-৪ এর ফলবান গাছ

ভূমিকা

আম (*Mangifera indica* L.) বিশ্বের গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্বাদু ফল। স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে আম অতুলনীয়, তাই একে বলা হয় ফলের রাজা। এটি বহুবর্ষজীবী এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক ফসল। ধারণা করা হয়, আমের উৎপত্তিস্থল চট্টগ্রামের পাহাড়াঞ্চল, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চল। চট্টগ্রামের পাহাড়াঞ্চলে মাইলাম (*Mangifera Sylvatica*) ও উরি আম (*Mangifera laurina*) নামক আমের দুটি বুনো প্রজাতি জন্মাতে দেখা যায়। উদ্ধৃত আছে এই *Mangifera Sylvatica* ও *Mangifera laurina* থেকে বর্তমান চাষের আমের উৎপত্তি।

আম বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ফল। যেহেতু বাংলাদেশ আমের উৎপত্তি স্থল, তাই নিঃসন্দেহে এদেশের মাটি ও জলবায়ু আম উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এ দেশে যে সকল ফল বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হয় আম তার মধ্যে অন্যতম। উৎকৃষ্টমানের আমের উৎপাদন বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলোতে সীমাবদ্ধ থাকলেও সাম্প্রতিককালে দেশের অন্যান্য জেলাতেও বাণিজ্যিকভাবে আম চাষ শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলাসহ দেশের ২৩টি জেলায় বাণিজ্যিকভাবে আম চাষ হচ্ছে। বিবিএস (২০২০) অনুসারে এ দেশে ফল চাষের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ এবং ফলের মোট উৎপাদন যথাক্রমে ৫.১৪ লক্ষ হেক্টর এবং ৫০.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন। যার এক পঞ্চমাংশ আমের আওতাভুক্ত। বর্তমানে এদেশে ৯৫.২৪ হাজার হেক্টর জমিতে আমের চাষ হচ্ছে যার বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় ১২.২২ লক্ষ মেট্রিক টন (বিবিএস, ২০২১)। যদিও, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে এদেশে প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয় যার বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

বাংলাদেশে প্রায় ৭২ ধরনের ফলের চাষ হয়। আয়তনে বিশ্বের অন্যতম ক্ষুদ্র দেশটি ফলের বৈচিত্রের পাশাপাশি ফল উৎপাদনে সফলতার উদাহরণ সৃষ্টি করে মৌসুমি ফলে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় নাম লিখিয়েছে। বিবিএস (২০২০) এর তথ্যমতে বাংলাদেশ মোট ফল উৎপাদনে বিশ্বে ২৮তম, আম উৎপাদনে সপ্তম এবং পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO) এর মতে বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ১০% হারে ফলের চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গত ১৮ বছরে এদেশে ফলের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১১.৫% এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে গত ১০ বছরে দেশের আমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সকল স্থানেই আম চাষ হচ্ছে তবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, যশোর, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুরের পাশাপাশি তিন পাহাড়ী জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে আমের বাণিজ্যিক বাগান সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আম সাধারণত কাঁচা, পাকা এমনকি হিমায়িত অবস্থায়ও খাওয়া যায়। এছাড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আম থেকে আমসত্ত্ব, জুস, পিওরি, আচার, চাটনি, মোরব্বা ইত্যাদি তৈরি করা যায়। বর্তমানে উৎপাদিত আমের ৮৫ শতাংশ সরাসরি খাওয়ার জন্য এবং অবশিষ্ট ১৫ শতাংশ প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পাকা আমে ৭৮.৬ গ্রাম জলীয় অংশ, ০.৪ গ্রাম খনিজ, ০.৭ গ্রাম আঁশ, ১.০ গ্রাম আমিষ, ০.৭ গ্রাম চর্বি, ২০.০ গ্রাম

শর্করা, ১৬.০ মি. গ্রা. ক্যালসিয়াম, ১.৩ মি. গ্রা. লৌহ, ০.১ মি. গ্রা. ভিটামিন বি-১, ০.০৭ মি. গ্রা. ভিটামিন বি-২, ৪১ মি. গ্রা. ভিটামিন সি, ৮৩০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন ও ৯০ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে। পুষ্টিবিদদের মতে, একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ফলের চাহিদা ২০০ গ্রাম কিন্তু এর বিপরীতে এদেশে প্রাপ্যতা হলো মাত্র ৮২ গ্রাম। যেহেতু আম এ দেশের মানুষের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফল এবং এর আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির হার সর্বাধিক। সুতরাং এ ঘাটতি পূরণে আম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এমতাবস্থায়, দেশের মানুষের ফলের চাহিদা পূরণে আমের ফলন ও গুণগতমান বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন।

আম উৎপাদনের প্রধান সমস্যাগুলো হলো গুণগত মানসম্পন্ন আম উৎপাদন করতে না পারা, মাত্রাতিরিক্ত ও ঘন ঘন কীটনাশক ব্যবহার, ফল সংরক্ষণ ও পাকানোর জন্য নির্বিচারে বিভিন্ন রাসায়নিকের ব্যবহার, মাঠ পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি অপ্রতুল ব্যবহার, আম চাষি ও শ্রমিকগণের প্রশিক্ষণের অভাব, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা এবং শ্রম অধিকার বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা না থাকা। আম অত্যন্ত পচনশীল এবং অধিক জলীয় অংশের কারণে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে প্রতি বছর যথাযথ সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার অভাবে দেশে উৎপাদিত আমের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমের পচন রোধে আম উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন। আমের পুষ্টিমান ও গুণাগুণ বজায় রেখে কিভাবে নিরাপদ আম ভোক্তার কাছে পৌছানো যায় সে লক্ষ্যে আমবাগান থেকে শুরু করে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই বিজ্ঞানভিত্তিক বিশেষ ব্যবস্থাপনা ও কৌশল অনুসরণ করা উচিত। উত্তম কৃষি চর্চা যার মধ্যে অন্যতম।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণ করে উৎকৃষ্ট ফল ও সবজি উৎপাদন করছে। বাংলাদেশে উত্তম কৃষি চর্চা এখনও মাঠ পর্যায়ে কার্যকর হয় নাই। কৃষি পণ্যের খাদ্যমান নিশ্চিত করে বিশ্ব বাজারে শক্ত অবস্থান সুনিশ্চিতকরণে আমাদের দেশেও বিভিন্ন ফসলের উত্তম কৃষি চর্চা অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। আশা করা যায়, এই পুস্তিকাটি আম চাষিদের গুণগত মানসম্পন্ন আম উৎপাদনে সহায়ক হবে এবং দেশে নিরাপদ ও বিষমুক্ত আমের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তম কৃষি চর্চার অনুসরণ তরান্বিত হবে।

উত্তম কৃষি চর্চা

উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) কি ?

উত্তম কৃষি চর্চা বা Good Agricultural Practices (GAP) হলো এক ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি যা সামগ্রিক কৃষি কার্যক্রমের পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুরক্ষা সুসংহত করে। ফলশ্রুতিতে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত কৃষিজাত পণ্য সহজলভ্য হয়। এটি একগুচ্ছ নীতি-বিধি ও প্রযুক্তিগত সুপারিশমালা যা সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবহনের বিভিন্ন স্তরে অনুসরণ করা হয় যা মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও কাজের পরিবেশ উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ সকল নিরাপদ মানদন্ড নিশ্চিতে বিশেষ করে ফসল মাঠে নির্দিষ্ট মানদন্ড অনুযায়ী নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য নীতিমালা বা পদ্ধতিই হলো বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা (Bangladesh GAP)।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে ২০১৫ সালে সবজি ও ফলের স্থানীয় বা এলাকাভিত্তিক "উত্তম কৃষি চর্চা স্কিম" এর আওতায় কৃষির প্রায় সকল সেক্টরের বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শে একটি পূর্ণাঙ্গ চাষাবাদ ম্যানুয়াল তৈরি করা হয় যা Bangladesh GAP নামে সমাধিক পরিচিত। রপ্তানির উদ্দেশ্যে বাগান স্থাপন করলে অবশ্যই Bangladesh GAP নীতিমালা প্রতিপালন করতে হবে।

উত্তম কৃষি চর্চা ৪টি মূলনীতি নিয়ে গঠিত

১ কার্যকর ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক উপায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন

২ পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ

৩ বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি, জীবনমান এবং টেকসই সামাজিক উন্নয়ন এবং

৪ নিরাপত্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও কর্মী/শ্রমিক কল্যাণ।

উত্তম কৃষি চর্চার উদ্দেশ্য

- নিরাপদ ও খাদ্যমান সম্পন্ন ফসলের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণ
- ফসল উৎপাদনে সহনীয় পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং কর্মীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও কল্যাণসাধন
- খাদ্য শৃঙ্খলের সকল স্তরে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ
- ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং
- গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা।

আমের বাণিজ্যিক ও রপ্তানিযোগ্য জাতসমূহ

বর্তমানে এদেশে প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় ৮০০ জাতের আম উৎপাদিত হচ্ছে, যদিও তাদের অধিকাংশই তেমন জনপ্রিয় নয়। কোন আমের জাত বাণিজ্যিক হতে হলে তা অবশ্যই জনপ্রিয় হতে হবে। দেশি-বিদেশি বাজারে চাহিদা, উৎপাদন এবং প্রাপ্যতা বিবেচনায় এ দেশের প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক ও রপ্তানিযোগ্য আমের জাতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট ও পরিচিতি নিম্নে দেয়া হলো।

বারি আম-২

প্রতি বছর ফলদানকারী রঙিন, উচ্চ ফলনশীল এবং মাঝ মৌসুমি জাত। ফলের গড় ওজন: ২৬০ গ্রাম, টিএসএস: ১৭.৫%, খাদ্যোপযোগী অংশ: ৬৯%। শাঁস গাঢ় হলুদ ও রসাল, খোসা পুরু এবং ফলন: ২০-২২ টন/হেক্টর।

বারি আম-৩

প্রতি বছর ফলদানকারী, উচ্চ ফলনশীল, সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত এবং নাবী জাত। ফলের গড় ওজন: ২১০ গ্রাম, টিএসএস: ২৩%, খাদ্যোপযোগী অংশ: ৭১%। শাঁস লালচে কমলা বর্ণের ও রসাল, খোসা পুরু এবং ফলন: ১৮-২০ টন/হেক্টর।

বারি আম-৪ (হাইব্রিড)

প্রতি বছর ফলদানকারী, উচ্চ ফলনশীল, সুস্বাদু এবং নাবী হাইব্রিড জাত। ফলের গড় ওজন: ৬০০ গ্রাম, টিএসএস: ২৪%, খাদ্যোপযোগী অংশ: ৮০%। শাঁস গাঢ় হলুদ, মাংশল ও রসাল, খোসা পুরু এবং ফলন: ১৫-২০ টন/হেক্টর।

বারি আম-৭ (রঙিন)

প্রতি বছর ফলদানকারী রঙিন, উচ্চ ফলনশীল, এবং মাঝ মৌসুমি জাত। ফলের গড় ওজন: ২৮৫ গ্রাম, টিএসএস: ১৮%, খাদ্যোপযোগী অংশ: ৭৭%। শাঁস হলুদ ও রসাল, খোসা পুরু এবং ফলন: ২০-২৫ টন/হেক্টর।

বারি আম-১১ (বারোমাসী)

বছরে তিনবার ফলদানকারী একটি সুস্বাদু এবং উচ্চ ফলনশীল জাত। ফলের গড় ওজন: ৩১৭ গ্রাম, টিএসএস: ১৮.৫%। খাদ্যোপযোগী অংশ: ৬৮%। শাঁস হলুদাভ কমলা, মধ্যম রসাল ও হালকা আঁশযুক্ত, খোসা পুরু এবং ফলন: ১২-১৫ টন/হেক্টর।

খিরসাপাত

মাঝ মৌসুমি সুস্বাদু বাণিজ্যিক জাত। আকার: অনেকটা ডিম্বাকৃতির, গড় ওজন: ২৬৪ গ্রাম, টিএসএস: ২৩%। শাঁস হলুদাভ, নরম ও রসাল, খোসা মধ্যম মোটা, খাদ্যোপযোগী অংশ: ৬৭.২% এবং ফলন ১৫-২০ টন/হেক্টর।

ল্যাংড়া

মাঝ মৌসুমি সুস্বাদু, ঘ্রানযুক্ত বাণিজ্যিক জাত। আকার: ডিম্বাকৃতির, গড় ওজন: ৩১৪ গ্রাম, টিএসএস: ২০%। শাঁস হলুদাভ, নরম ও রসাল, খোসা অত্যন্ত পাতলা, খাদ্যোপযোগী অংশ: ৭৩% এবং ফলন ১৫-১৭ টন/হেক্টর।

ফজলি

বাণিজ্যিক নাবী জাত। আকার: কিছুটা তির্যকভাবে ডিম্বাকৃতির ও লম্বা, গড় ওজন: ৫৮০ গ্রাম, টিএসএস: ১৮%। শাঁস হলুদ থেকে হলুদাভ কমলা বর্ণের, মধ্যম নরম ও রসাল, খোসা বেশ পুরু, খাদ্যোপযোগী অংশ: ৭৯% এবং ফলন ২০-২২ টন/হেক্টর।

বোম্বাই

এটি মধ্যম মৌসুমি সুস্বাদু জাত। পরিপক্ব আমের রঙ হালকা সবুজ বর্ণের। আকার: গোলাকৃতির, গড় ওজন: ৩৬০ গ্রাম, টিএসএস: ২০%। শাঁস হলুদাভ কমলা, রসাল, খোসা পুরু, খাদ্যোপযোগী অংশ: ৭৫% এবং ফলন ২০-২২ টন/হেক্টর।

ব্যানানা ম্যাংগো

এটি একটি নাবী জাত। পরিপক্ব ফলের রঙ হালকা সবুজ হতে হলুদ রঙের। আকার: লম্বাকৃতির, গড় ওজন: ১৯০ গ্রাম, টিএসএস : ১৮%। শাঁস হলুদ হতে হলুদাভ কমলা, মধ্যম রসাল, খোসা পুরু, খাদ্যোপযোগী অংশ: ৭৯% এবং ফলন ১৩-১৫ টন/হেক্টর।

বারি আম-১৩ (হাইব্রিড)

এটি উচ্চ ফলনশীল ও অধিক নাবী হাইব্রিড জাত। গড় ওজন: ২২০ গ্রাম, টিএসএস: ২১%। খাদ্যোপযোগী অংশ: ৭৪.৬%। ফলন: ৫-৬ টন/হেক্টর (চৌদ্দ বছর বয়সী)।

বারি আম-১৪ (রঙিন)

এটি একটি নাবী জাত। পরিপক্ব ফল আকর্ষণীয় হলুদাভ গাঢ় লাল রঙের। ফলের গড় ওজন: ৫৬৯ গ্রাম, টিএসএস: ২২.৮৩%। খাদ্যোপযোগী অংশ: ৭৫.৩৫% এবং ফলন: ১৩-১৪ টন/হেক্টর।

বারি আম-১৫

এটি একটি উচ্চ ফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী ও নাবী জাতের আম। গড় ওজন: ৬৮০ গ্রাম। টিএসএস: ২৪%। খাদ্যোপযোগী অংশ: ৮২.৩৫% এবং ফলন: ২০-২২ টন/হেক্টর।

বারি আম-১৬

উচ্চ ফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী ও অধিক নাবী জাতের আম। ফল জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। গড় ওজন: ৫৭১ গ্রাম। টিএসএস: ২৫%। খাদ্যোপযোগী অংশ: ৮০.২% এবং ফলন: ২২-২৪ টন/হেক্টর।

বারি আম-১৭ (হাইব্রিড)

একটি উচ্চ ফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী ও অধিক নাবী হাইব্রিড জাতের আম। ফল জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। গড় ওজন: ৬৫০ গ্রাম। টিএসএস: ২৫.৫০% এবং ফলন: ১২-১৫ টন/হেক্টর।

আমের আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল

আম গাছ হতে কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে হলে স্থান নির্বাচন থেকে শুরু করে ফল বিক্রয় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে বিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেগুলো সময়মত ও সঠিকভাবে করতে পারলে প্রতি বছর লাভবান হওয়া যাবে। এখানে আমবাগান স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

স্থান নির্বাচন

বাণিজ্যিক আম চাষাবাদের ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে কোন ভুল সিদ্ধান্ত বড় আকারের অর্থনৈতিক ক্ষতি ও উৎপাদিত ফলের গুণগতমানের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

আমবাগানের স্থান নির্বাচনের পূর্বে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন- বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, যাতায়াত ব্যবস্থা, মাটি ও জলবায়ুর উপযোগিতা, বাজার সংযোগ, সর্বোপরি শ্রমিকের প্রাপ্যতার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

জমি ও মাটি

- আম চাষের জন্য উঁচু হতে মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে
- আম প্রায় সব ধরনের মাটিতে হয়, তবে ভালোমানের আম উৎপাদনের জন্য মধ্যম বুনটের গভীর ও পানি নিষ্কাশন ক্ষমতাসম্পন্ন মাটি অধিক উপযোগী। জমির অম্লমান (pH) ৭.৮-৮.৪ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে কিছুটা কম বা বেশি হলেও আম উৎপাদন করা সম্ভব। ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের গভীরতা বছরব্যাপী ১৮০ সে. মি. এর নিচে থাকা বাঞ্ছনীয়
- পাহাড়ী এলাকার জন্য জমির ঢাল ৪৫ ডিগ্রির নিচে হওয়া ভালো।

জাত নির্বাচন: আমগাছ বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ এবং দীর্ঘ দিন বাঁচে। ফলে নতুন আমবাগান স্থাপনের জন্য সুবিবেচনা প্রসূত পরিকল্পনা দরকার। যেহেতু আমবাগান একবার তৈরি হয়ে গেলে তা সংশোধন করা শ্রম ও সময়সাপেক্ষ এবং অর্থনৈতিকভাবেও ঝুঁকিপূর্ণ, এমনকি অনেক সময় তা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আমবাগান স্থাপনের পূর্বেই বেশ কিছু বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভালোজাতের গুণগত মানসম্পন্ন কলম নির্বাচন। আমের কলম অবশ্যই বিশ্বস্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

আমের জাত: বাণিজ্যিক চাষের জন্য জাত নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু, মাটি, বাজার চাহিদা এবং অঞ্চলের ওপর ভিত্তি করে জাত নির্বাচন করতে হবে। বাগান স্থাপনের পূর্বে কোন জাতের আমের চাহিদা বেশি, গুণগতমান ভালো এবং বাজার মূল্য অধিক তা জানা দরকার। বিএআরআই প্রতি বছর ফল দিতে সক্ষম এমন ১৮টি উচ্চ ফলনশীল আমের জাত উদ্ভাবন করেছে। এ জাতগুলোর মধ্যে কয়েকটি রঙিন, হাইব্রিড, সুগন্ধযুক্ত এবং রপ্তানিযোগ্য। এছাড়াও দেশে বেশ কিছু বাণিজ্যিক জাত রয়েছে যেমন: ল্যাংড়া, খিরসাপাত, হিমসাগর, ফজলি, গোপালভোগ ইত্যাদি। এ জাতগুলো রঙিন না হলেও স্থানীয় বাজারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে এবং এ জাতসমূহের চাষাবাদও বেশ লাভজনক। এ জাতগুলোও বিদেশে রপ্তানির সুযোগ আছে।

কলম নির্বাচন

- এলাকা এবং আবাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কলম নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ
- কলমটি হতে হবে ভালো জাতের ও অনুমোদিত মাতৃগাছ থেকে উৎপন্ন
- কলম অবশ্যই সরকারি অথবা নির্ভরযোগ্য নার্সারি হতে সংগ্রহ করতে হবে
- কলমটি অবশ্যই সুস্থ, সবল এবং রোগ ও পোকা-মাকড় মুক্ত হতে হবে
- কলমটির কান্ডের দৈর্ঘ্য শিকড়ের দৈর্ঘ্যের ৪ গুণের বেশি হবে না
- কলমটি হবে ২-৩ টি সুস্থ-সবল শাখাযুক্ত এবং ১.০-১.৫ বছর বয়স্ক
- জোড় কলমের আদিজোড় এবং উপজোড়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে এবং সঠিকভাবে জোড়া লাগতে হবে। এতে কোন ফুল/মুকুল বা ফল থাকবে না

আমের কলম সংগ্রহ: আমের কলম অবশ্যই নির্ভরযোগ্য উৎস হতে সংগ্রহ করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন বিএআরআই; হর্টিকালচার সেন্টার, ডিএই; বিএডিসি; বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন ব্রাক, প্রশিকা এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি মালিকানাধীন নার্সারী যেমন- পঞ্চগড় নার্সারী, শাহ নার্সারী, আজাদ নার্সারী, কৃষিবিদ নার্সারী, প্রকৃতি নার্সারী প্রভৃতি হতে মানসম্পন্ন এবং সঠিক জাতের কলম সংগ্রহ করতে হবে।

ফিল্ড লে-আউট: চারা রোপণের নকশাকে ফিল্ড লে-আউট বলে। আম বহুবর্ষজীবী এবং বৃহদাকার গাছ তাই রোপণের পূর্বে নকশা তৈরি করতে হবে। বাণিজ্যিক বাগান স্থাপনের প্রথমে একটি ড্রয়িং কাগজে চারা রোপণের নক্শা বা ফিল্ড লে-আউট অঙ্কন করতে হবে। একজন উদ্যানতত্ত্ববিদের পরামর্শ মোতাবেক ফিল্ড লে-আউট তৈরি করা উচিত। সাধারণত সমভূমির জন্য বর্গাকার আয়তাকার বা ষড়ভূজি পদ্ধতি এবং পাহাড়ী জমির জন্য কন্টোর পদ্ধতির নকশা অনুসরণ করা হয়।

চিত্র: ফিল্ড লে-আউট

জমি তৈরি: জমি তৈরির পূর্বে জমি হতে আগাছা ও অন্যান্য গাছপালা অপসারণ করতে হবে। সমতল ভূমিতে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে কোদালের সাহায্যে জমি তৈরি করতে হবে। পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে সিঁড়ি (ধাপ) তৈরি করে চারা লাগাতে হবে। সিঁড়ি তৈরি করা সম্ভব না হলে পাহাড়ের ঢালে নির্দিষ্ট দূরত্বে গোলাকার বা অর্ধচন্দ্রাকৃতির বেড তৈরি করে গাছ লাগানো যেতে পারে। সমতল ভূমিতে পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা তৈরি করতে হবে।

রোপণের সময়

- জুন-জুলাই মাস আমের চারা/কলম রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়
- সেচের সুবিধা থাকলে বছরের যে কোন সময় কলমের চারা রোপণ করা যায়

রোপণ দূরত্ব

চারা রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে জাত, মাটির উর্বরতা এবং জমির সার্বিক অবস্থার ওপর। আমের বাগান তৈরিতে দূরত্ব ও চাষোপযোগী এলাকা নিম্নে দেয়া হলো:

সারণী-১: আমের বিভিন্ন উন্নত জাতের রোপণ দূরত্ব ও চাষোপযোগী এলাকা

ক্রমিক নং	জাত	রোপণ দূরত্ব (মিটার)	এলাকা
০১	ল্যাংড়া, খিরসাপাত, হিমসাগর, ফজলি, গোপালভোগ, আশ্বিনা	১০ × ১০	রাজশাহীসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল
০২	বারি আম - ১, ২, ৫, ৬, ৭	৮ × ৮	সমগ্র বাংলাদেশ
০৩	বারি আম- ৪, ১১, কাটিমন	৬ × ৬	সমগ্র বাংলাদেশ
০৪	বারি আম- ৩, ৮, ব্যানানা ম্যাংগো	৪ × ৪	সমগ্র বাংলাদেশ

গর্ত তৈরি

- রোপণের জন্য গর্তের আকার সাধারণত ০.৭৫ × ০.৭৫ × ০.৭৫ মিটার হলে ভালো হয়
- গর্ত প্রতি ২০-২৫ কেজি পচা গোবর বা জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম, ২৫ গ্রাম জিংক সালফেট এবং ৫০ গ্রাম বোরিক এসিড গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে তা দিয়ে গর্ত ভর্তি করতে হবে
- চারা রোপণের জন্য গর্ত ভরাট করে ১০-১৫ দিন খোলা রাখতে হবে
- মাটি খুব শুকনো হলে গর্ত ভরাটের পর পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে
- গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে কলমের চারা রোপণ করতে হবে।

চিত্র: কলমের চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরির বিভিন্ন ধাপ

রোপণ প্রণালী ও নকশা: রোপণ প্রণালী হল বাগানে রোপিত চারার পারস্পারিক অবস্থান ও মাঠের লে-আউটের বাস্তব রূপ। রোপণ প্রণালীর উপর চারার সংখ্যা ও রোপণ দূরত্ব এবং জমির আকৃতির উপর রোপণ প্রণালী নির্ভর করে।

- আমের ক্ষেত্রে চারা রোপণের জন্য সমতল ভূমিতে বর্গাকৃতি পদ্ধতি সবচেয়ে উপযুক্ত। এ পদ্ধতিতে রোপণ করলে সকল গাছ চারি দিকে সমান দূরত্ব পায়
- তবে ২-৩ সারিতে রোপণের ক্ষেত্রে আয়তকার পদ্ধতিও গ্রহণযোগ্য
- পাহাড়ী জমিতে কন্টোর পদ্ধতিতে গাছ রোপণ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

- রোপণের জন্য গর্ত প্রস্তুত করার ১০-১৫ দিন পর মাটিসহ গর্তের ঠিক মধ্যখানে একটি সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা রোপণ করতে হবে
- রোপণের পূর্বে চারার শিকড়ের কোনরূপ ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সাবধানতার সহিত মাটির পাত্র বা পলিব্যাগ অপসারণ করতে হবে
- রোপণের পর গোড়ার চারি পাশের মাটি হালকাভাবে চেপে দিতে হবে
- একটি খুঁটির সাথে চারাটি ভালোভাবে বেঁধে দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে খুঁটির সাথে চারাটি যাতে ঘষা না খায়।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা: রোপণের সময় চারা বা কলমের কোনরূপ ক্ষতি না হয় এবং গোড়াটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাটির গভীরে ঢুকিয়ে না দেয়া হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। রোপণের পর বৃষ্টি না থাকলে কয়েকদিন সেচ দিতে হবে।

চিত্র: কলমের চারা ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

বেড়া দেয়া: চারা বা কলমটি গৃহপালিত পশুর একটি পছন্দনীয় খাদ্য। এরা প্রথমে গাছের পাতা খাওয়ার চেষ্টা করে। এরপর গাছের বাকল বা ছাল খেয়ে ফেলে। যে কোন উপায়ে কলম লাগানোর প্রথম কয়েক বছর নতুন গাছের পাতা ও বাকল গৃহপালিত পশুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

সার ব্যবহার: গাছের উপযুক্ত বৃদ্ধি, ফলের গুণাগুণ এবং অধিক ফলনশীলতার জন্য মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি উপাদান থাকা জরুরি। এলাকাভেদে গাছের বয়স ও মাটির প্রকৃতির ওপর পুষ্টির চাহিদা

নির্ভর করে। ফসলের জন্য জৈব সার অত্যন্ত জরুরি, তবে উত্তম কৃষি চর্চার ক্ষেত্রে জৈব সারের নিরাপদ ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিপূর্ণভাবে পচে যাওয়া জৈব পদার্থ ব্যবহারের পূর্বে অণুজীবীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। গাছের বয়স ভিত্তিক সারের মাত্রা সারণী-২ এ দেওয়া হলো:

সারণী-২: আমের গাছের বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক সারের মাত্রা

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০ এর উর্দ্ধে
গোবর (কেজি)	২৬	৩৫	৪৫	৫৫	৭০	১০০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৪৩৮	৮৭৫	১৩১২	১৭৫০	২৬২৫	৩৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	৪৩৮	৪৩৮	৮৭৫	৮৭৫	১৩১২	১৭৫০
এমওপি (গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৮	৭০০	৮৭৫	১৪০০
জিপসাম (গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৮	৬১৩	৭০০	৮৭৫
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১৮	১৮	২৬	২৬	৩৫	৫০
বোরিক এসিড (গ্রাম)	৩৫	৩৫	৫০	৫০	৭০	১০০

সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে:

- সারের পরিমাণ মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উত্তম। তবে তা সম্ভব না হলে "ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন গাইড ২০১৮" অনুসরণ করতে হবে
- অনুমোদিত ও রেজিস্টার্ড সার ব্যবহার করতে হবে এবং তা অবশ্যই বিশ্বস্থ বিক্রেতার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সার যে কোন ধরণের বিষাক্ত পদার্থ বিশেষ করে হেভি মেটালমুক্ত হতে হবে
- পরিচর্যা বিশেষ করে সার ও চুন প্রয়োগের বিবরণ সংরক্ষণ করতে হবে
- গোবর/জৈব পদার্থের স্তূপ/গাদা পানির উৎস হতে দূরবর্তী স্থানে স্থাপন করতে হবে
- জৈব সার ইটের হাউজে বা মাটির গর্তে রাখতে হবে, যাতে বৃষ্টির পানি, সূর্যের আলো বা বাতাসে দূষিত বা সংক্রমিত হতে না পারে।

সার প্রয়োগ: সারের পরিমাণ নির্ভর করে গাছের বয়স, আকৃতি এবং মাটিতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের উপর। চারা লাগানোর পর ৩/৪ বছর গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন সার বেশি দেওয়া ভালো। প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অধিকাংশ জৈব সার দিয়ে মেটাতে পারলে ভালো হয়। গাছের গোড়ায় রিং বা নালা পদ্ধতিতে সার দেওয়া উত্তম। তবে মাটিতে ছিটিয়েও সার প্রয়োগ করা যায়। নালা পদ্ধতিতে সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে গাছের গোড়া থেকে যে দূরত্ব পর্যন্ত ডালপালা বিস্তৃত সেই দূরত্বকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে গাছের গোড়া হতে দুই ভাগ দূরে

চিত্র: সার প্রয়োগ পদ্ধতি

(সেখানে অধিক হারে খাদ্য আহরণকারী শেকড় বিদ্যমান) ৩০ সে. মি. প্রশস্ত ও ১৫-২০ সে. মি. গভীর একটি চক্রাকার নালা তৈরী করে সেই নালার ভিতর গাছের বয়স অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে।

- এক থেকে তিন বছর বয়সী গাছের ক্ষেত্রে গোড়া হতে ৩০-৪৫ সে. মি. দূরত্বে ১৫ সে. মি. চওড়া ও ১০-১৫ সে. মি. গভীর গর্তে সার প্রয়োগ করতে হবে
- তিন থেকে সাত বছর বয়সী গাছের ক্ষেত্রে গাছের গোড়া হতে ১.০-১.৫ মিটার, ১০-১৫ বছর বয়সী গাছে হতে ২-৩ মিটার এবং ১৫ বছরের বেশি বয়সী গাছের ক্ষেত্রে ৪ মিটার দূরত্বে সার প্রয়োগ করতে হবে
- আমগাছে সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি আম সংগ্রহের পর জুন-জুলাই মাসে এবং ২য় কিস্তি বর্ষা মৌসুম শেষে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে রসের অভাব থাকলে সার দেয়ার পর সেচ প্রদান করতে হবে। আম গাছে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সার প্রয়োগ না করাই উত্তম।

সেচ প্রয়োগ: ফলবান গাছে সেচ প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন মতামত থাকলেও গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, আম উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমবাগানে সেচের প্রয়োজন হয়। চারা রোপণের প্রথমে মাস খানেক নিয়মিত পানি সেচ দিতে হয়। খরা মৌসুমে (নভেম্বর-মে মাস পর্যন্ত) ১৫ দিন অন্তর সেচ দিলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। পরিবর্তিত বেসিন পদ্ধতিতে গাছের গোড়ার চারিদিকে এক মিটার জায়গা সমান্য উঁচু রেখে দুপুর বেলা যতটুকু স্থানে ছায়া পড়ে ততটুকু স্থানে একটি থালার মতো করে বেসিন তৈরি করে সেচ দেয়া ভালো, কারণ এতে পানির অপচয় কম হয় এবং গাছ অধিক পানি গ্রহণ করতে পারে। ফলবান গাছে প্রথমবার সম্পূর্ণ মুকুল ফোটা অবস্থায় এবং দ্বিতীয়বার ফল মটরদানাকৃতি হলে সেচ দিতে হবে। তবে খরা প্রবণ এলাকায় সম্পূর্ণ ফুল ফোটার পর্যায় থেকে ফল পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত ১৫ দিন পর পর ৪-৬টি সেচ প্রয়োগ করলে ফলন বৃদ্ধি পায় এবং আমের মান ভালো হয়।

চিত্র: সেচ প্রয়োগে বেসিন পদ্ধতি

আগাছা দমন: আগাছা গাছের খাদ্যে ভাগ বসায়, ফলে গাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। আমগাছের গোড়ায় যাতে আগাছা না জন্মায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বর্ষা আরম্ভ হওয়ার সময় একবার এবং শেষে দ্বিতীয়বার জমির আগাছা দমন করতে হবে। তবে বছরের অন্যান্য সময়ও বাগানে আগাছা জন্মাতে পারে। সুতরাং আমবাগানে আগাছা জন্মালে তা দমন করতে হবে। আগাছা

চিত্র: আমগাছে পরগাছার বিস্তার

দমন করতে বাগানে লাঙ্গল বা টিলারের সাহায্যে মাঝে মাঝে চাষ দেয়া যেতে পারে। আগাছানাশক ব্যবহার করেও আমবাগানের আগাছা দমন করা যায়।

পরগাছা বা ধ্যারা অপসারণ: আমগাছে দুই ধরনের পরগাছা জন্মাতে দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে পরগাছা ধ্যারা নামে পরিচিত। ছোট গাছের চেয়ে বড় বা বয়স্ক আমগাছে পরগাছার আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। পরগাছার বীজ আম গাছের ডালে অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরগাছা ডাল থেকে প্রয়োজনীয় পানি, খাদ্যরস, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি শোষণ করে বেঁচে থাকে। আক্রমণ বেশি হলে গাছের ডালপালার অস্তিত্ব থাকে না বরং পরগাছা প্রভাব বিস্তার করে বাড়তে থাকে। লরানথাস জাতীয় পরগাছার পাতা দেখতে অনেকটা আম পাতার মত ফলে সনাক্ত করা কঠিন। আমগাছে পরগাছা বা ধ্যারা দেখা মাত্রই আক্রান্ত ডালসহ তা অপসারণ করতে হবে।

ডালপালা ছাঁটাইকরণ: আম পাড়ার পর পরই রোগ বা পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। ছাঁটাই এমনভাবে করতে হবে যেন গাছের ভিতরের অংশে সর্বাধিক পরিমাণ সূর্যালোক পৌঁছাতে পারে। গাছের ভিতরমুখী ডালে সাধারণত ফুল-ফল হয় না, তাই এ ধরনের ডাল কেটে ফেলা উচিত। কাটা অংশে রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বোর্দোপেস্ট (১০০ গ্রাম চুন + ১০০ গ্রাম তুঁতে + ১ লিটার পানি) এর প্রলেপ দিতে হবে।

গাছের মুকুল ভাঙন: কলমের গাছের বয়স ২ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙে দিতে হবে। কারণ প্রথম বছর থেকে আম নেওয়া শুরু করলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং পরবর্তীতে সুন্দর কাঠামোর গাছ তৈরি করা সম্ভব হয় না।

বংশবিস্তার ও চারা কলম উৎপাদন

একটি গাছ থেকে নতুন একটি গাছের জন্ম হওয়ার পদ্ধতিকে বংশবিস্তার বলে। যে প্রক্রিয়ায় গাছ যৌন কোষ বা তার অঙ্গজ কোষ থেকে নতুন স্বতন্ত্র গাছ সৃষ্টি করে তাকে বংশবিস্তার বলে। আমগাছ সাধারণত দু'ভাবে বংশবিস্তার করে থাকে যেমন: যৌন উপায়ে অর্থাৎ বীজ দ্বারা এবং অঙ্গজ উপায়ে অর্থাৎ ডাল বা অন্য অংশ দ্বারা।

বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার: নিষিক্ত বীজ বা আঁটি ফলের ভেতর রক্ষিত থাকে, যা উপযুক্ত পরিবেশে অংকুরিত হয়ে নতুন গাছের জন্ম দেয়। বীজে সাধারণত পুরুষ ও স্ত্রী উভয় অংশ বিদ্যমান থাকে। ফলে বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে মাতৃ গাছের গুণাগুণ বজায় থাকে না। এছাড়াও বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে ফল ধরতেও বেশি সময় লাগে এবং গাছের আকার-আকৃতি তুলনামূলকভাবে বড় হওয়ায় একক জমিতে অল্প পরিমাণ গাছ লাগানো যায়। গাছ থেকে ফল সংগ্রহ ও অন্যান্য পরিচর্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বহুভ্রুণী বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার: আমে বেশ কিছু বহুভ্রুণী (Polyembryony) জাত রয়েছে যেমন: বারি আম-৮, ক্যারাবাউ, পাহুতান, গোরা, চন্দ্রকরণ ইত্যাদি। যেখানে একটি বীজ থেকে একাধিক চারা জন্মায়। এর মধ্যে একটি মাত্র চারা নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে উৎপন্ন হয় একে জাইগোটিক চারা বলে। বাকীগুলো নিউসেলাস টিস্যু থেকে উৎপন্ন হয় বলে নিউসেলার চারা হিসাবে পরিচিত। জাইগোটিক চারায় মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকে না। পক্ষান্তরে নিউসেলার চারা মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকে ও ভাইরাস রোগ মুক্ত হয়। নিউসেলাস চারাগুলোর বৃদ্ধি একই রকমের হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে জাইগোটিক চারাগুলো সাধারণতঃ দুর্বল হয়। তবে অঞ্চল বা জলবায়ুর বিভিন্নতায় বহুভ্রুণী জাতগুলো এই বৈশিষ্ট প্রকাশ নাও করতে পারে।

অঙ্গজ বংশবিস্তার: আমে অঙ্গজ বংশবিস্তার বহুল প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন চারা গাছে ১-২ বছরের মধ্যে ফল ধরে এবং ফল মাতৃগুণ সম্পন্ন হয়। রোগবালাই প্রতিরোধী ও খরা সহনশীল ক্ষমতা সম্পন্ন আদিজোড় নির্বাচনের মাধ্যমে কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়। অঙ্গজ বংশবিস্তার ১. গ্রাফটিং ২. বাডিং ৩. কাটিং এবং ৪. গুটি কলম প্রভৃতি পদ্ধতিতে করা যায়। তবে আমের অঙ্গজ বংশবিস্তার গ্রাফটিং বা জোড়কলম পদ্ধতিতেই করা হয়। গ্রাফটিং করতে হলে প্রথমে বীজ হতে চারা উৎপাদন করা হয় যা আদিজোড় বা রুটস্টক নামে পরিচিত। তারপর মাতৃগাছ থেকে উপজোড় বা সায়ন সংগ্রহ করে রুটস্টকের চারার উপর গ্রাফটিং করা হয়। কলম থেকে উৎপন্ন গাছে মাতৃগুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে, ফল ধরতে তুলনামূলক কম সময় লাগে, ফলের আকার ও গুণগতমান ভালো হয় এবং গাছ থেকে ফল সংগ্রহ ও অন্যান্য পরিচর্যা করা সহজ হয়। গাছ ছোট হওয়ায় অল্প জমিতে বেশি গাছ লাগিয়ে উৎপাদন ও আয় বাড়ানো সম্ভব।

রুটস্টক বা আদিজোড়: জোড় কলমের নিচের অংশ (বীজের চারা) যার উপর কাঙ্ক্ষিত জাতের শাখা (সায়ন) জোড়া লাগানো হয় তাকে রুটস্টক বা আদিজোড় বলা হয়। সাধারণত: ১০-১২ মাস বয়সের বীজের চারা রুটস্টক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আদিজোড় বা রুটস্টক হিসেবে ব্যবহারের জন্য বীজতলা: আমের চারা উৎপাদনের জন্য উর্বর, উঁচু, পর্যাপ্ত আলো বাতাস পায়, বর্ষার পানি দাঁড়ায় না ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধা আছে এমন স্থান নির্বাচন করে সেখানে বীজতলা তৈরি করতে হবে। নিচে বীজতলার প্রকার ও পরিমাপ দেয়া হলো:

- **বীজতলার প্রকার:** ১ম বীজতলা- অংকুরোদগমের জন্য, ২য় বীজতলা- অংকুরিত চারা রোপণের জন্য
- **বীজতলার মাপ:** দৈর্ঘ্য- ৫ মিটার বা প্রয়োজন মত, প্রস্থ- ১ মিটার এবং উচ্চতা-কমপক্ষে ১৫ সে. মি.। দুটি বীজতলার মাঝে ৫০ সে. মি. স্থান ড্রেনের জন্য ফাঁকা রাখতে হবে
- বীজতলার পরিবর্তে সরাসরি পলিব্যাগ বা মাটির পটেও চারা লাগানো যায়
- এক ভাগ দো-আঁশ মাটি, ১ ভাগ পচা গোবর বা জৈব সার, ১ ভাগ ভিটি বালি এবং ১ ভাগ কোকো ডাস্ট দিয়ে দ্বিতীয় বীজতলা বা পলিব্যাগের মাটি তৈরি করতে হবে। পচা গোবর বা জৈব সারের অর্ধেক পরিমাণ ট্রাইকোকম্পোস্ট ব্যবহার করলে গোড়া পচা রোগের আক্রমণ কম হয়।

রুটস্টকের জন্য আমের আঁটি নির্বাচন: ভালোমানের আদিজোড় বা রুটস্টকের জন্য ব্যবহৃত আঁটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত আগাম ও মধ্যম গুটি জাতের আমের আঁটি রুটস্টক তৈরির জন্য উত্তম। এ জন্য মাঝারি আকারের ভারী ও পুষ্ঠ আঁটি নির্বাচন করতে হবে। বীজতলায় আমের আঁটি বপনের পূর্বে পানিতে ভিজিয়ে নিতে হবে। যেসব আঁটি পানিতে ডুবে যায় শুধুমাত্র সে সব আঁটিই চারা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে হবে। রুটস্টকের জন্য অবশ্যই রোগবালাই মুক্ত পাকা আম থেকে আঁটি সংগ্রহ করতে হবে।

রুটস্টক (আদিজোড়) তৈরিকরণ: মানসম্মত কলমের জন্য আদিজোড় বা রুটস্টক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভালোমানের রুটস্টক ব্যতিত মানসম্পন্ন কলম উৎপাদন সম্ভব নয়। কাঙ্ক্ষিত মানের রুটস্টক তৈরির জন্য নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে-

- সুস্থ সবল গাছের পরিপুষ্ট আম হতে সংগৃহিত পুষ্ট ও বড় আকারের আঁটিগুলো চারা উৎপাদনের জন্য নির্বাচন করতে হবে
- আমের আঁটি দ্রুত তার অংকুরোদগম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাই আম থেকে আঁটি সংগ্রহের ৭ দিনের মধ্যে তা রোপণ করতে হবে
- প্রথম বীজতলায় ৩-৪ সে. মি. দূরত্বে লাইন করে ২-৩ সে. মি. পর পর আঁটি স্থাপন করতে হবে। আঁটি বপনের পর ৫ সে. মি. মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলায় আঁটি স্থাপনের পর থেকে গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতিদিন অল্প অল্প সেচ দিতে হবে। বীজতলায় পানি জমলে তা দ্রুত অপসারণ করতে হবে
- অংকুরোদগমের পরপরই আঁটিসহ চারা সাবধানে দ্বিতীয় বীজতলায় অথবা পরিব্যাগ বা মাটির পটে লাগাতে হবে। বীজতলায় রোপণের ক্ষেত্রে ৩০ সে. মি. পর পর লাইন করে ৩০ সে. মি. দূরত্বে চারা লাগাতে হবে
- ২য় বীজতলায় রোপণের পর প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। অতিরিক্ত সেচ দিলে চারা গোড়া পচা রোগে আক্রান্ত হতে পারে
- চারা গজানোর পর মাঝে মাঝে বালাইনাশক ছিটাতে হবে যেন চারায় রোগ ও পোকার আক্রমণ করতে না পারে
- রুটস্টক হিসেবে ৮ হতে ১৮ মাস বয়সের সুস্থ, সবল ও সোজাভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত চারা নির্বাচন করতে হবে। চারার পত্রকক্ষ থেকে উৎপন্ন কুড়ি দেখা মাত্র কেটে দিয়ে সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে ১ বছরের পূর্বেই আদিজোড়/চারা গ্রাফটিং করার উপযুক্ত হয়।

উপজোড় বা সায়ন: সায়ন হচ্ছে মাতৃগাছের ৩-৪ মাস বয়সের প্রান্তশাখা বা ডগা যা কলম তৈরিতে উপজোড় হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাতৃগাছ নির্বাচন: মাতৃগাছ নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে-

- বিশুদ্ধ জাতের, নিয়মিত ফল প্রদানকারী অধিক ফলনশীল, বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনাময় ও রপ্তানিযোগ্য ফল প্রদানকারী গাছ
- আমের গুণাগুণ (মিষ্টতা, আঁশ, খাদ্যোপযোগী অংশ ইত্যাদি)
- রোগ ও পোকামাকড়ের প্রতি সংবেদনশীলতা।

ভালো সায়নের বৈশিষ্ট: সায়ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হবে-

- সায়ন বা প্রান্ত শাখার বয়স ৩-৪ মাস হতে হবে
- প্রতিটি সায়নে একাধিক বেশ পুষ্ট ও বড় চোখ বা কুঁড়ি থাকতে হবে
- চোখ বা কুঁড়িগুলো অবশ্যই সুপ্ত (ফুটে যায়নি এমন) হতে হবে
- সায়ন রোগ ও পোকামাকড়মুক্ত হতে হবে।

সায়ন নির্বাচন ও সংগ্রহ: কাঙ্ক্ষিত জাতের রোগমুক্ত, সুস্থ, সতেজ ও অধিক ফলনশীল গাছ থেকে সায়ন সংগ্রহ করতে হবে। সায়ন সংগ্রহের জন্য মাতৃগাছের বয়স ৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হওয়া ভালো।

- গোলাকার বা কিছুটা কৌনিক চ্যাপ্টা ডাল সায়ন হিসাবে ব্যবহার করা যায়
- সায়নের পাতার কক্ষের কুঁড়িটি ফুটে গেলে আর ব্যবহার করা যাবে না
- গাছ থেকে সায়ন সংগ্রহের পর এর পাতা কেটে ছায়ায় রাখতে হবে
- সায়ন সংগ্রহ করার পর যত দ্রুত সম্ভব কলম করতে হবে
- বিশেষ পদ্ধতিতে সায়ন সংগ্রহের পর ২/৩ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

জোড় কলম তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতি: গাছের অঙ্গজ বংশবৃদ্ধির একটি পদ্ধতি হল জোড় কলম। আদিজোড় বা রুটস্টকের উপর কাঙ্ক্ষিত জাতের গাছের কর্তনকৃত উপজোড় বা সায়ন জোড়া লাগিয়ে নতুন গাছ তৈরি করার নাম গ্রাফটিং বা জোড় কলম। আমে প্রধানত ভিনিয়ার ও ক্লেফ্‌ট বা ফাটল কলম অধিক প্রচলিত। এর উৎকৃষ্ট সময় এপ্রিল-মে তবে আগস্ট/সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কলম করা যায়।

ভিনিয়ার কলম: এটি একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে গ্রাফটিং করলে সফলতার হার সবচেয়ে বেশি এবং তা সময়ভেদে শতকরা ৮০-১০০ ভাগ। তিন থেকে চার মাস বয়সী সায়ন সংগ্রহ করে ১০-১২ মাস বয়সী রুটস্টকে কলম করা ভালো। এ পদ্ধতিতে স্টকের পেন্সিল-মোটা স্থানের একপাশে ৩-৫ সে. মি. লম্বা করে উপর থেকে নিচে ক্রমশ তীর্যকভাবে বাকলসহ কিছুটা কাঠ কেটে ফেলতে হবে। কাটার শেষ প্রান্তের সামান্য উপর থেকে তীর্যকভাবে চাপ দিয়ে কাটা অংশ তুলে ফেলতে হবে।

অনুরূপভাবে সায়নের নিচের দিকে তীর্যকভাবে পাতলা করে কেটে সেখানে বসিয়ে দিতে হবে যাতে স্টকের খাঁজের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। এরপর পলিথিন স্ট্রীপ দিয়ে স্টক-সায়নের জোড়কে বেঁধে

দিতে হবে। প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা রক্ষায় পলিথিনের ঢাকনা ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত ১৫-২০ দিনের মধ্যেই স্টক-সায়ন জোড়া লেগে যায় এবং সায়নের কুঁড়ি ফুটে নতুন পাতা বের হয়। সায়নের পাতাগুলো পুষ্ট ও সবুজ হলেই স্টকের মাথা কেটে দিতে হবে। স্টক গাছ যদি পলিথিন ব্যাগ বা টবে না করে বীজতলায় করা হয় তবে পরবর্তী বছর বৃষ্টির মৌসুমে খাসি করে (শাবল বা খুন্তি দিয়ে চারার গোড়া থেকে কিছুটা দূর থেকে তেরছাভাবে প্রধান শেকড় কেটে দেয়া) মাসখানেক পর সাবধানে তুলে ছন বা খড় দিয়ে মাটির বল মুড়িয়ে দিতে হবে যেন তা না ভেঙ্গে যায়। এরপর কলমগুলো কয়েকদিন ছায়ায় রাখতে হবে। এরপর এগুলো মাঠে লাগানোর উপযোগি হবে।

চিত্র: ক্লেফট ও ভিনিয়ার গ্রাফটিং এর বিভিন্ন ধাপ

ক্লেফ্‌ট বা ফাটল কলম: অযৌন বংশবিস্তার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ক্লেফ্‌ট গ্রাফটিং বা ফাটল জোড় কলম জনপ্রিয় এবং অধিক প্রচলিত পদ্ধতি। অন্যান্য জোড় কলমগুলোর তুলনায় এ পদ্ধতিতে কর্তিত স্থানের দুই পাশ দিয়ে জোড়া লাগে বিধায় জোড়াটি সবল হয় এবং সহজে জোড়া স্থানটি ভাঙ্গার সম্ভাবনা থাকে না। তুলনামূলকভাবে এ পদ্ধতি সহজ, সফলতার হার বেশি এবং খরচও কম পড়ে।

এ পদ্ধতিতে ৮-১২ মাস বয়সী চারার মাথা মাটি থেকে ১৫-২৫ সে. মি. উচ্চতায় কেটে কান্ডকে ৩-৫ সে. মি. লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত করে নিতে হবে। একইভাবে সায়ন তীর্যকভাবে দু'পাশ থেকে তেরছা করে কাটতে হবে যেন সায়নের গোড়ার দিকটা ৩-৪ সে. মি. পর্যন্ত ক্রমশ বর্শার ফলার মত হয় এবং তা কর্তিত কান্ডের ফাটলের ভিতর বসিয়ে পলিথিন স্ট্রীপ দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সায়নের চোখ বা কুঁড়ি ফুটে গেলে পলিথিনের ঢাকনা খুলে ফেলতে হবে।

স্টোন বা আঁটি কলম: এটা একটি সম্ভাবনাময় পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে খুব অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক চারা তৈরি করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে বীজতলায় আঁটি ফেলে জুন-জুলাই মাসে চারা তৈরি করতে হবে। চারার বয়স ৭-১৫ দিন হলে আঁটি থেকে ৪-৫ সে. মি. উপরে কান্ডের মাথা কেটে ফেলে লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত করে নিতে হবে। তিন-চার মাস বয়সী সায়নের পাতা ফেলে দিয়ে নিচের অংশ দুই দিকেই তীর্যকভাবে কেটে ক্লেফ্‌ট গ্রাফটিং এর ন্যায় স্টকের ফাটলের মধ্যে বসিয়ে মজবুত করে বেঁধে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাঝে মাঝে পানি দিতে হবে। সায়নের চোখ বা কুঁড়ি ফুটে গেলে পলিথিনের ঢাকনা খুলে ফেলতে হবে।

বীজ ও কলম বৃদ্ধির মাধ্যম: বীজের অঙ্কুরোদগম ও কলমের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য এবং বিক্রি বা মূল জমিতে রোপণের পূর্বে পলিব্যাগ বা মাটির টবে স্থাপনের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য এবং দ্রব্যাদির

মিশ্রণ যুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। ভালো ফলাফলের জন্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট সমৃদ্ধ মাধ্যম নির্বাচন করা প্রয়োজন-

- মাধ্যমটি এমন হবে যাতে বীজ বা কলমকে যথাস্থানে ধরে রাখতে পারে এবং ভেজা বা শুষ্ক অবস্থায় এর আয়তন পরিবর্তন না হয়
- এতে যথেষ্ট পরিমাণে আর্দ্রতা সংরক্ষণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে
- অতিরিক্ত পানি নিকাশ এবং মূলের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন প্রবেশের নিমিত্ত মাধ্যমটিকে যথেষ্ট পরিমাণে রন্ধ্রময় হতে হবে
- এটি অবশ্যই বিভিন্ন আগাছার বীজ, নেমাটোড, পোকা-মাকড় এবং রোগ জীবাণুমুক্ত হতে হবে
- এটি লবণাক্ততা মুক্ত হতে হবে এবং এর পিএইচ মান হবে ৬.৫-৭.৫
- কোন ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়াই মাধ্যমটির বাষ্প বা রাসায়নিক দ্রব্যাদি দ্বারা জীবাণুমুক্ত হওয়ার সামর্থ্য থাকতে হবে
- যদি চারা/কলম দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে হয় তবে মাধ্যমটি যথেষ্ট ও দীর্ঘ মেয়াদী পুষ্টিসমৃদ্ধ হবে হবে। এ ক্ষেত্রে মাধ্যমে ধীরে অবমুক্তকারী সম্পুরক সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

চারা-কলমের পরিচর্যা: ভালোমানের চারা কলম উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পালন করতে হবে:

- বীজতলায় পানির অভাব দেখা দিলে প্রয়োজনীয় পানি সেচ দিতে হবে
- নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে
- আদিজোড় বা রুটস্টক থেকে গজানো কুঁড়ি বা ডাল ভেঙ্গে দিতে হবে
- সায়নের কুড়ি ফুটে গেলে পলিথিন খুলে ফেলতে হবে। ভিনিয়ার কলমের সায়নের পাতা সবুজ রং ধারণ করলে আদিজোড়ের ডগা কেটে দিতে হবে
- নাড়াচাড়ার সময় কলমের গোড়ার মাটির বলটি যেন ভেঙে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে
- কলমে এ্যানথ্রাকনোজ, ডাই-ব্যাক অথবা ম্যালফরমেশন রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত ডাল কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কাটাস্থানে বোর্দোপেস্ট (১০০ গ্রাম চুন + ১০০ গ্রাম তুঁতে+ ১ লিটার পানি) এর প্রলেপ লাগাতে হবে
- লিফ কাটিং উইভিলের আক্রমণ প্রতিরোধে কাটা পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। কচি পাতা বের হবার পরপর কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক ২ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে নতুন পাতায় স্প্রে করতে হবে।

মাতৃগাছের যত্ন ও পরিচর্যা: ভালোমানের সায়ন উৎপাদনের জন্য মাতৃগাছের নিয়মিত যত্ন ও পরিচর্যা অপরিহার্য। জাত অনুসারে প্রতিটি গাছে স্থায়ী ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে। গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য সঠিক মাত্রায় সুষম সার ও সেচ প্রয়োগ করতে হবে। গাছে এ্যানথ্রাকনোজ, ডাই-ব্যাক বা আগা মরা, ম্যালফরমেশন প্রভৃতি রোগ এবং কান্ড ছিদ্রকারী পোকা এবং লিফ কাটিং উইভিল প্রভৃতি পোকা যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় ও তাদের দমন ব্যবস্থাপনা

এ দেশে আমের ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। বেশ কিছু কারণ এর জন্য দায়ী। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পোকার আক্রমণ। অনুকূল পরিবেশে পোকার বংশবৃদ্ধি এবং আক্রমণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আমের ফলন শূন্যের কোঠায় পৌঁছাতে পারে। তাই আমের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পোকা দমন অপরিহার্য। আমের পোকা দমনের জন্য সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন পূর্বক তা সঠিক মাত্রায়, সঠিক সময়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া সম্ভব। পোকামাকড় দমনে আক্রমণের পূর্বেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ। এতে খরচ যেভাবে হ্রাস পাবে তেমনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফলও পাওয়া যাবে। আমের প্রধান প্রধান ক্ষতিকারক পোকা, তাদের ক্ষতির ধরন এবং দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

হপার বা ফুদকি পোকা (Mango Hopper: *Amritodus atkinsoni*)

হপার আমের অন্যতম প্রধান ক্ষতিকারক পোকা। বর্তমানে আম গাছে হপার পোকার প্রাদুর্ভাব বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সঠিক সময়ে এই পোকাটি দমনে ব্যর্থ হলে আমের ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে পারে এবং গাছের বৃদ্ধি কমে যেতে পারে। এই পোকার আক্রমণে আমের উৎপাদন শতভাগ নষ্ট হতে পারে। আমের মুকুল বের হওয়ার সাথে সাথে এ পোকা মুকুলকে আক্রমণ করে। এই পোকা আমের মুকুল থেকে রস চুষে খায় ফলে মুকুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে।

চিত্র: পূর্ণবয়স্ক হপার পোকা এবং আক্রান্ত ডগা ও মুকুল

চিত্র: সুটিমোল্ড আক্রান্ত আমগাছের পাতা ও পুষ্পমঞ্জুরী

একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষণ করে খায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়। এ রস আঁঠালো যা মধুরস বা হানিডিউ (Honeydew) নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুল, ফুল ও গাছের পাতায় জমা হয় এবং এতে এক প্রকার ছত্রাক জন্মায়। যা সুটিমোল্ড বা ঝুল রোগ নামে পরিচিত বলে। এই ছত্রাকের কারণে আমের মুকুল, ফুল ও পাতার উপর কালো আবরণ পড়ে এবং গাছের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- হপার পোকা অন্ধকার বা বেশি ছায়াযুক্ত স্থান পছন্দ করে। তাই নিয়মিতভাবে গাছের ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে যাতে গাছের মধ্যে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে
- আমের মুকুল বা পুষ্পমঞ্জুরী বের হওয়ার আনুমানিক ১৫-২০ দিন পূর্বে একবার, আমের মুকুল যখন ১০-১২ সে. মি. হয় অর্থাৎ ফুল ফোঁটার পূর্বে একবার এবং আম যখন মটর দানাকৃতি হয় তখন আরো একবার ইমিডাক্লোপ্রিড/সাইপারমেথ্রিন/কার্বারিল বা থায়োমেথোক্সাম+ফিপ্রোনিল জাতীয় কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় পানির সাথে মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছের মুকুল, পাতা ও কান্ড ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে
- আমের হপার পোকার কারণে যেহেতু সুটিমোল্ড বা ঝুল রোগের আক্রমণ ঘটে সুতরাং এই রোগ দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক হপার পোকা দমনের জন্য ব্যবহার্য কীটনাশকের সাথে নির্দেশিত মাত্রায় মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

ফল ছিদ্রকারী পোকা (Fruit borer: *Citripestis eutraphera*)

বর্তমানে এটি আমের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। আম মার্বেল আকারের হলেই এ পোকার আক্রমণ শুরু হয় এবং আমের আঁটি শক্ত হওয়া পর্যন্ত তা অব্যহত থাকে। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকা আমের নিচের অংশের নাভির চারপাশে ডিম পাড়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই ডিম ফুটে কীড়া বের হয়। কীড়া ছিদ্র করে আমের ভিতর ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। আক্রান্ত স্থানটি কাল হয়ে যায়। আক্রান্ত স্থানে জীবাণুর আক্রমণের ফলে পচন ধরে। অধিক আক্রান্ত আম ফেটে যায় এবং গাছ থেকে পড়ে যায়।

চিত্র: পূর্ণবয়স্ক ফল ছিদ্রকারী পোকা এবং আক্রান্ত ফল

দমন ব্যবস্থাপনা

- আমবাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- আক্রান্ত আম সংগ্রহ করে মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে
- আক্রমণ দেখা দিলে ফেনিট্রোথিয়ন, সাইপারমেথ্রিন বা থায়োমেথোক্সাম + ফিপ্রোনিল জাতীয় কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে
- আমের গুটির বয়স ৪০ দিন হলে ব্যাগিং করে কার্যকরভাবে ফল ছিদ্রকারী পোকার ক্ষতির হাত থেকে আমকে রক্ষা করা যাবে।

মাছি পোকা (Fruit fly: *Bactocera dorsalis*)

মাছি পোকা আমের জন্য বেশ ক্ষতিকর এবং আমের একটি কোয়ারেন্টাইন পেস্ট। এ পোকা কাঁচা আমের তেমন ক্ষতি না করলেও পাকা আমকে খাবারের অনুপোযোগী করে ফেলে। বারি আম-২, বারি আম-৩, বারি আম-৪, ফজলি, ল্যাংড়া, খিরসাপাতসহ বিভিন্ন জাতের পরিপক্ব আমে এ পোকার প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় মাছি পোকার আক্রমণ বুঝা যায় না তবে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে আক্রান্ত আমের গায়ে ডিম পাড়ার স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়। ক্ষত স্থানটি কিছুটা বিবর্ণ হয়ে যায়। আক্রান্ত আম পাকা শুরু হলে এ আক্রান্ত স্থান থেকে রস ঝরতে দেখা যায়। পাকা আম কাটলে আক্রান্ত আমের শাঁসের ভিতর সাদা সাদা পোকার কীড়া দেখা যায়। এ পোকায় আক্রান্ত আম বিকৃত হয়ে পড়ে বা পচে যায়, এবং প্রায়শই খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

চিত্র: পূর্ণবয়স্ক মাছি পোকা এবং আক্রান্ত ফল

দমন ব্যবস্থাপনা

- আম গাছে না পাকিয়ে শারীরবৃত্তিক পরিপক্ব আম সংগ্রহ করে বাড়িতে নিয়ে পাকালে এ পোকার আক্রমণ হ্রাস পায়
- মাছি পোকাক্রান্ত আম সংগ্রহ করে মাটির নিচে গভীর গর্তে পুতে ফেলতে হবে
- বিষটোপ ব্যবহার করে সফল ভাবে মাছিপোকা দমন করা যায়। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আমের রসের সাথে ২ মি. গ্রা. কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক মিশিয়ে বিষটোপ তৈরি করা যায়

চিত্র: ব্যাগিংকৃত আমগাছ

- আমবাগানে মিথাইল ইউজেনল (Methyl Eugenol) ফেরোমন ট্রাপ ব্যবহার করেও এই পোকার আক্রমণ হ্রাস করা যেতে পারে। এই ট্রাপে পুরুষ পোকা আকৃষ্ট হয়ে মারা যায় এবং বাগানে মাছি পোকার আক্রমণ কমে যায়
- আম পাকার মৌসুমে আমবাগানে ব্লিচিং পাউডার (প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম) স্প্রে করে মাছি তাড়ানো যেতে পারে
- আম পাকার মৌসুমে (আম সংগ্রহ করার ৩০-৩৫ দিন পূর্বে) প্রতিটি আম দুই স্তরের বাদামি ব্যাগ দ্বারা ব্যাগিং করে এ পোকার আক্রমণ শতভাগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

এপসিলা পোকা (Shoot-gall psyllid: *Apsylla cistellata*)

এপসিলা আমের একটি ক্ষতিকর পোকা। এপসিলা পোকার আক্রমণ হঠাৎ করে বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও দেখা যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এটি তাবিজ পোকা নামে পরিচিত। এ পোকার আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি ও আমের উৎপাদন কমে যায়। এ পোকা কচি পাতার মধ্যশিরার টিস্যু ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিমের ভিতরে ভ্রূণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং প্রায় ১৬০ দিনে পূর্ণাঙ্গ নিম্ফে পরিণত হয়। এ সময়ে এরা পাতার রস চুষে খায় এবং এ প্রকার রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে যার প্রভাবে পত্রকক্ষে সুঁচালো মুখবিশিষ্ট সবুজ রংয়ের মোচাকৃতি গলের সৃষ্টি হয়। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ নিম্ফ বের হয়ে উক্ত গলের ভিতরে অবস্থান নিয়ে কান্ডের রস চুষে খেতে থাকে। ফলে কান্ডের অগ্রভাগ শুকিয়ে যায় এবং মুকুল ধারণ ব্যহত হয়।

চিত্র: এপসিলা আক্রান্ত ডগা

দমন ব্যবস্থাপনা

- মার্চ-এপ্রিল মাসে পাতায় এ্যাপসিলা পোকার ডিম পাড়ার ক্ষতচিহ্ন দেখা গেলে কার্বারিল, ইমিডাক্লোপ্রিড, ল্যামডাসাইহ্যালাথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক নির্দেশিত হারে মিশিয়ে পাতা ও ডালপালা ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে
- অক্টোবর-নভেম্বর মাসে নিম্ফসহ গল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

কান্ডের মাজরা পোকা (Stem borer: *Batocera rufomaculata*)

কান্ডের মাজরা পোকা আম গাছের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ পোকা গাছের কান্ড বা শাখাকে আক্রমণ করে। চারাগাছে এ পোকার আক্রমণ হলে চারা গাছটি মারা যেতে পারে। বাংলাদেশের সর্বত্রই আমগাছে এ পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র: কান্ডের মাজরা পোকা আক্রান্ত কান্ড ও গাছ

দমন ব্যবস্থাপনা

- গাছের কান্ড বা শাখায় কোন ছিদ্র বা সুড়ঙ্গ দেখতে পাওয়া গেলে ঐ সুড়ঙ্গে সূঁচালো লোহার শিক বা সাইকেলের স্পোক ঢুকিয়ে পোকাটির কীড়াকে খুঁচিয়ে মেরে ফেলতে হবে
- সুড়ঙ্গটি ভালোভাবে পরিস্কার করে তার মধ্যে ন্যাপথলিন, কেরোসিন, পেট্রোল অথবা নগসে ভিজানো তুলা ঢুকিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ কাদা দিয়ে ভালোভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। ফলে ভিতরে থাকা পোকা মারা যাবে।

পাতার গল মাছি (Leaf gall midge: *Procontarinia matteiana*)

বিভিন্ন প্রজাতির গল সৃষ্টিকারী পোকা আম গাছের পাতায় আক্রমণ করে। আমাদের দেশে গলমাছি তেমন মারাত্মক ক্ষতির কারণ না হলেও কিছু কিছু অঞ্চলে এর আক্রমণের তীব্রতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ পোকার আক্রমণে পাতায় গলের পরিমাণ বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। স্ত্রী পোকা আমের কচি পাতার নিচের দিকে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ৩-৪ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে ম্যাগোট বা বাচ্চা বের হয়। পরে এরা পাতার কোষ এবং টিস্যুসমূহে প্রবেশ করে রস খাওয়ার কারণে পাতায় গলের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীদের মতে গলমাছি মার্চ মাসে দেখা যায় এবং বছরে মোট ১-৩ বার বংশ বৃদ্ধি করে। ছোট গলমাছি আম গাছের কচি পাতায় আক্রমণ করে। ফলে বিভিন্ন প্রকারের গলের সৃষ্টি হয়। এ পোকার আক্রমণে পাতার উপরে, নিচে কিংবা উভয় পৃষ্ঠে বেশ শক্ত গলের সৃষ্ট হয়। এ পোকার বিভিন্ন প্রজাতির আক্রমণের কারণে বিভিন্ন আকার, আকৃতি ও বর্ণের যেমন- ধুসর, বাদামী, সবুজ, লাল ইত্যাদি গলের সৃষ্টি হয়।

চিত্র: পাতার গল মাছি দ্বারা আক্রান্ত পাতা

দমন ব্যবস্থাপনা

- আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে
- আক্রমণ দেখা গেলে কার্বারিল, ল্যামডাসাইহ্যালাথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক নির্দেশিত হারে ভালোভাবে মিশিয়ে পাতা ও ডালপালা ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে
- অক্টোবর-নভেম্বর মাসে নিম্ফসহ গল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে
- ছায়াযুক্ত ও ঘনভাবে রোপণকৃত আম গাছে গলের আক্রমণ বেশি হয়। এজন্য আম সংগ্রহ করার পর কিছু ডালপালা ছাঁটাই করা ভালো।

পাতা কাটা উইভিল (Leaf cutting weevil: *Deporaus marginatus*)

নার্সারীতে চারা গাছের কচি পাতায় এই পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়। পূর্ণ বয়স্ক পোকা ছোট, ধুসর বাদামী রঙের উইভিল যার লম্বা বাদামী রঙের শুঁড় ও কালো রঙের শক্ত পাখা আছে। এরা বছরে কমপক্ষে তিন বার বংশবৃদ্ধি করে। এ পোকা গাছের কচি পাতা কেটে ক্ষতি করে। কচি পাতার নিচের পিঠে মধ্যশিরার উভয় পাশে স্ত্রী পোকা ডিম পাড়ে। পরে স্ত্রী পোকা ডিমপাড়া পাতাটির বোঁটার কাছাকাছি কেটে দেয়। এইভাবে একটি গাছ পাতাশূন্য হয়ে পড়ে এবং গাছের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। ডিমসহ পাতাটি মাটির সংস্পর্শে এলে ডিম থেকে নিম্ফগুলি বের হয়ে মাটিতে প্রবেশ করে এবং সেখানে পূর্ণঙ্গ পোকায় পরিণত হয়।

চিত্র: পাতা কাটা উইভিল এবং আক্রান্ত ডগা

দমন ব্যবস্থাপনা

- কর্তিত কচি পাতা মাটি থেকে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে
- গাছে কচি পাতা বের হওয়ার ৫-৬ দিন পর এক বার এবং ১২-১৩ দিন পর একবার প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সেভিন বা ২ মি. লি. সুমিথিয়ন অথবা ১ মি. লি. রিপকর্ড স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ রোধ করা যায়। সকাল বেলায় স্প্রে করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে
- চারা গাছে কচি পাতা বের হওয়ার সময় পলিথিন বা কাগজের ব্যাগ দ্বারা ঢেকে রেখে এই পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

মিলিবাগ/ছাতরা পোকা (Mealy bug: *Drosicha mangiferae*)

অতীতে আম ফসলে মিলিবাগের আক্রমণ দেখা না গেলেও বর্তমানে আমগাছে এর আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ পোকা আমের কচি ও বয়স্ক পাতা, কচি ডগা ও ফলে আক্রমণ করে থাকে। এরা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে কচি পাতা ও কচি ডগার রস শোষণ করে খায়। ফলে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

চিত্র: মিলিবাগ দ্বারা আক্রান্ত আম

দমন ব্যবস্থাপনা

- বাগানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে
- এই পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম যে কোন স্পর্শক কীটনাশক অথবা ২ গ্রাম গুড়া সাবান একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

সেমিলুপার (Semilooper: *Perixera illepidaria*)

ছোট বড় সকল আম গাছে এ পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। খুব ভালোভাবে লক্ষ্য না করলে মনে হবে গাছটি এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দ্বারা আক্রান্ত। কিন্তু খুব কাছে থেকে লক্ষ্য করলে গাছের কচি পাতা ও ডগায় এ পোকার উপস্থিতি চোখে পড়বে। এ পোকার লার্ভা গাছের কচি পাতা ও ডগায় আক্রমণ করে। মানুষের উপস্থিতি টের পেলেই এরা ডগার সাথে লম্বালম্বিভাবে লুকিয়ে পড়ে, ফলে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য না করলে পোকার উপস্থিতি সনাক্ত করা যায় না। এ পোকার লার্ভা বর্ধনশীল ডগার বাকল ও কচি পাতা খেয়ে নষ্ট করে থাকে। পরবর্তীতে জায়গাটি কালো হয়ে যায় এবং এবং চারা বা কলমের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

চিত্র: সেমিলুপার দ্বারা আক্রান্ত ডগা

দমন ব্যবস্থাপনা

- মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ডগা কেটে ফেলতে হবে
- এই পোকা দমনের জন্য স্পর্শক কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

পাতাখেকো শুঁয়ো পোকা (Leaf eating caterpillar: *Penicillaria jocosatrix*)

এ পোকার আক্রমণে গাছ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পত্র শূন্য হয়ে পড়ে। শুঁয়ো পোকা পত্রফলক সম্পূর্ণ খেয়ে শুধুমাত্র মধ্যশিরা বা পার্শ্বশিরাগুলো রেখে গাছকে পত্রশূন্য করে ফেলে। আক্রান্ত গাছে অসময়ে নতুন বিটপ বের হয় ফলে গাছে ফুল আসে না।

চিত্র: পাতা খেকো শুঁয়ো পোকা দ্বারা আক্রান্ত পাতা

দমন ব্যবস্থাপনা

- পূর্ণতাপ্রাপ্ত শুঁয়ো পোকা কীটনাশক প্রয়োগে মারা খুব কঠিন বিধায় আম গাছে শুঁয়ো পোকার ছোট ছোট কীড়া দেখা মাত্র সেগুলো পাতাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে
- এ পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক যেমন কনফিডর ৭০ ডব্লিউজি ০.৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

স্কেল পোকা (Scale insect: *Aulacaspis tubercularis*)

স্কেল পোকা আমের একটি ক্ষতিকারক পোকা। এ পোকাগুলো কচিপাতা, ডগা এবং আমের রস শোষণ করে থাকে। রস শোষণের ফলে জায়গাটি বিবর্ণ হয়ে যায়। এ পোকার আক্রমণের ফলে পরবর্তীতে শুটিমোল্ড জন্মাতে দেখা যায়।

চিত্র: স্কেল পোকা দ্বারা আক্রান্ত পাতা

দমন ব্যবস্থাপনা

- এ পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক ০.৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

আমের প্রধান রোগ-বালাই ও তাদের দমন ব্যবস্থাপনা

আম এদেশে উৎপাদিত অর্থকরী ফলগুলোর মধ্যে অন্যতম। তথাপি, এ দেশে আমের ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো বিভিন্ন রোগের আক্রমণ। অন্যান্য ফসলের ন্যায় আমেও বেশ কিছু রোগের আক্রমণ হয়, যা আমের উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। আমের উৎপাদন বাড়াতে হলে উক্ত রোগ-বালাই দমন করা অপরিহার্য। আমের প্রধান রোগসমূহ এবং এর দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

এ্যানথ্রাকনোজ (Anthracnose)

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে আমের সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগ হলো এ্যানথ্রাকনোজ। *Colletotrichum gloeosporioides* নামক এক প্রকার ছত্রাক দ্বারা এই রোগ হয়। আম গাছের কচি পাতা, কান্ড, মুকুল, কুঁড়ি ও আমে এর আক্রমণ দেখা যায়। সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে এই রোগের আক্রমণে পাকা আম নষ্ট হয়ে যায়। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় অক্রান্ত অংশে ছোট ছোট কালো দাগ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তিতে পাশাপাশি দাগসমূহ একত্রিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। বেশি আক্রান্ত পাতা, মুকুল, কুঁড়ি ও কচি আমে ঝরে পড়ে। কচি অবস্থায় আক্রান্ত স্থানের কোষগুলো দ্রুত মারা যায়। আমের মুকুল বা ফুল আক্রান্ত হলে ফলধারণ ব্যাহত হয় এবং অনেক সময় আমের ফলন শত ভাগ নষ্ট হয়ে যায়।

চিত্র: এ্যানথ্রাকনোজ আক্রান্ত পাতা, ফল ও মুকুল

প্রতিকার

- রোগাক্রান্ত বা মরা ডালপালা ছাঁটাই করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে
- গাছের রোগাক্রান্ত ঝরা পাতা ও আম সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে বা মাটি চাপা দিতে হবে
- রোগের আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে মেনকোজেব বা টেবুকোণাজল + ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন বা এজোক্সিস্ট্রবিন + ডাইফেনোকোনাজল ইত্যাদি ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। মুকুল ১০-১২ সে. মি. লম্বা হলেই প্রথম বার এবং মটর দানার মত হলে ২য় বার স্প্রে করতে হবে। এতে কচি আম রক্ষা পাবে এবং ঝরে পড়া রোধ হবে। এ সকল ছত্রাকনাশক হপার দমনের জন্য ব্যবহৃত কীটনাশকের সাথে মিশিয়েও একত্রে স্প্রে করা যায়
- গাছ থেকে আম সংগ্রহ করার পরপরই গরম পানিতে (৫৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৫ মিনিট) ডুবিয়ে রাখার পর শুকিয়ে সংরক্ষণ করলে আমের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস পাবে।

গামোসিস বা আঁঠা ঝরা (Gummosis)

বর্তমানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এ রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অতি অল্প বয়স্ক (১-৫ বছর) এবং বয়স্ক (৪০-১০০ বছর) গাছে রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। তবে অপুষ্টিতে আক্রান্ত যে কোন বয়সের গাছেই এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। *Lasiodiplodia theobromae* নামক এক প্রকার ছত্রাক দ্বারা এই রোগ হয়। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে গাছের প্রধান কান্ড থেকে এক প্রকার আঁঠালো রস বা আঁঠা বের হয়। প্রথমে গাছের পাতা মলিন হয়ে যায়, আঁঠা ঝরার পরিমাণ বেড়ে গেলে আক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। অনেক সময় মরা ডালের পাতা ঝরে না পড়ে ডালের সাথে লেগে থাকে। আক্রান্ত বাকলের কিছু কিছু জায়গা ফেটে যেতে পারে। আক্রান্ত ডগা বা শাখা-প্রশাখা শুকিয়ে যেতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে আক্রান্ত গাছ ধীরে ধীরে মারা যায়। অনেক সময় গাছের গুঁড়ি বা ডাল থেকে রস ঝরা বা কোন বাহ্যিক লক্ষণ দৃষ্টি গোচর হয় না।

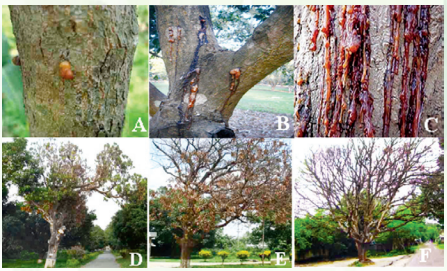

চিত্র: গামোসিস রোগাক্রান্ত কান্ড ও গাছ

প্রতিকার

- আমগাছ ও আমবাগান সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নিয়মিত ডাল-পালা ছাঁটাই করতে হবে। গাছে কোন অবস্থাতেই মরা ডাল রাখা যাবে না
- গাছে নিয়মিত পরিচর্যা (সুষম সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান, রোগ ও পোকা দমন) করতে হবে
- আক্রান্ত ডগা বা শাখা-প্রশাখা কেটে ফেলতে হবে। কান্ডে আঁঠা ঝরা দেখামাত্র কিছুটা সুস্থ অংশসহ আক্রান্ত বাকল তুলে ফেলে কর্তিত অংশে বোর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে এবং সমগ্র কান্ডে কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাক নাশক প্রতি লিটার পানিতে ৭ গ্রাম/লি. হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে
- আক্রান্ত গাছে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা প্রপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটরি পানিতে ১ মি. লি. হারে মিশিয়ে পাতা, ডাল এবং গাছের গুড়িতে ৭-১০ দিন পর পর ৮-১০ বার ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে ছত্রাকনাশক স্প্রে করে সুফল পাওয়া যায়।

পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew)

Oidium mangiferae নামক এক প্রকার ছত্রাক দ্বারা এই রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণ প্রধানত আমের মুকুল ও কচি আমে দেখা যায়। প্রথমে আমের মুকুলের শীর্ষ প্রান্তে সাদা বা ধূসর বর্ণের পাউডারের আবরণ দেখা যায়। অনুকূল আবহাওয়ায় এই পাউডার দ্রুত সম্পূর্ণ মুকুলে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত মুকুলের সমস্ত ফুল নষ্ট হয়ে যায়। বেশি আক্রান্ত কচি আম ঝরে পড়ে।

চিত্র: পাউডারি মিলডিউ আক্রান্ত পুষ্পমঞ্জুরী

প্রতিকার

- মুকুল আসার সময় প্রতিদিন আমগাছ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দিলেই সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

আগামরা (Die back)

Colletotrichum gloeosporioides নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাতেই আমগাছে আগামরা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। রোগের লক্ষণ প্রথমে আক্রান্ত কান্ডের শীর্ষদেশে প্রকাশ পায় এবং মরা ডাল উপরের দিক থেকে নিচের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, সেজন্য এ রোগকে আগামরা নামে অভিহিত করা হয়। রোগের আক্রমণে গাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং গাছের ফলধারণ ক্ষমতা কমে যায়। এ রোগের আক্রমণে কোন কোন সময় সম্পূর্ণ গাছ মারা যায়।

চিত্র: আম গাছে আগামরা রোগের লক্ষণ

প্রতিকার

- আক্রান্ত ডাল কিছু সুস্থ অংশসহ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কাটা অংশে রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বোর্দোপেষ্টের (১০০ গ্রাম চুন + ১০০ গ্রাম তুঁতে + ১ লিটার পানি) প্রলেপ দিতে হবে
- গাছে নতুন কুশি বা পাতা বের হলে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিনের ব্যবধানে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বোঁটা পচা (Stem-end rot)

বোঁটা পচা আমের একটি মারাত্মক সংগ্রহোত্তর রোগ। *Lasiodiplodia theobromae* নামক এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে আমের বোঁটায় বাদামী অথবা কালো দাগ দেখা দেয়। জীবাণু ফলের শাঁসকে আক্রমণ করে এনজাইম নিঃসরণের মাধ্যমে আমের কোষগুলোকে দ্রুত পচিয়ে ফেলে। আক্রান্ত আম ২/৩ দিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্র আবহাওয়া রোগের দ্রুত বিস্তারের জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

চিত্র: বোঁটা পচা রোগাক্রান্ত পাকা আম

প্রতিকার

- মেঘমুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে গাছ থেকে আম পাড়তে হবে। আম পাড়ার সময় যাতে আঘাত না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে
- ৫ (পাঁচ) সে. মি. বোঁটাসহ আম পাড়লে রোগের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়
- সংগৃহিত আম গাছের তলায় জমা না রেখে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে
- আম সংগ্রহ করার পর হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট (৫৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৫/৭ মিনিট) করে গুদামজাত করলে বোঁটা পচার ভয় থাকে না।

আমের দাদ রোগ (Scab disease)

এ রোগের কারণ *Elsinoe mangiferae* নামক ছত্রাক। আমের আকার মটর দানার মত হলেই এ রোগের আক্রমণ শুরু হতে পারে। আক্রান্ত আমের শরীর বাদামী রং ধারণ করে, খোসা ফেটে যায় ও খসখসে হয়ে উঠে। আক্রান্ত আমের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যে তা ঝরে পড়ে। এ রোগের আক্রমণে আমের বাজার মূল্য কমে যায় এবং রপ্তানির অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

চিত্র: দাদ রোগাক্রান্ত আম

প্রতিকার

- রোগের আক্রমণ দেখা মাত্রই রোভরাল প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে অথবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে ভালোভাবে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

লাল মরিচা রোগ (Red rust disease)

Cephaleuros virescens নামক এক প্রকার শৈবাল এর আক্রমণে লাল মরিচা রোগ হয়। লাল মরিচা রোগ প্রধানত পাতায় দেখা যায়। দাগের মধ্যে অবস্থিত শৈবালের দেহের কারণে পাতার উপরিভাগ মখমলের মত কোমল মনে হয়। অধিক তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতা এ রোগের বৃদ্ধি ও বিস্তারে সহযোগিতা করে তাই বর্ষাকালে রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। দেশি আমের জাতের চাইতে বিদেশি জাতে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

চিত্র: লাল মরিচা রোগাক্রান্ত পাতা

প্রতিকার

- রোগ প্রতিরোধী জাতের আমগাছ লাগাতে হবে। রোগাক্রান্ত ঝরা পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে
- বর্ষা শুরু হলে বোর্দো মিক্সচার (১০ গ্রাম চুন + ১০ গ্রাম তুঁতে + ১ লিটার পানি) বা ম্যাকুপেক্স (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম) ১৫ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করে গাছ রোগমুক্ত রাখা যায়।

বিকৃতি (Malformation)

চিত্র: ম্যালফরমেশন রোগাক্রান্ত ডগা ও মুকুল

আক্রমণের স্থান অনুযায়ী বিকৃতি দুই প্রকার। যেমন: মুকুলের বিকৃতি (Floral malformation) ও দৈহিক বিকৃতি (Vegetative malformation)। বিকৃতি রোগে আক্রান্ত মুকুলে ফল ধারণ করে না তাই ফলন মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে। দৈহিক বিকৃতি সাধারণত চারা গাছ বা ছোট গাছে বেশি দেখা যায়। অধিক আক্রান্ত চারা গাছ মারা যেতে পারে। *Fusarium moniliforme var. subglutinans* নামক ছত্রাক এ রোগের প্রকৃত কারণ বলে বিজ্ঞানীরা একমত পোষণ করেছেন।

প্রতিকার

- রোগমুক্ত গাছের বীজ থেকে চারা উৎপাদন করতে হবে এবং কলম তৈরি করার সময় রোগমুক্ত গাছ থেকে ডগা বা সায়ন সংগ্রহ করতে হবে।
- রোগমুক্ত এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতের আমগাছ লাগাতে হবে
- মুকুল বিকৃতি দেখা দেওয়া মাত্রই আক্রান্ত মুকুল কেটে ফেলতে হবে
- দৈহিক বিকৃতি দেখা মাত্রই আক্রান্ত শাখা কেটে ফেলে কাটা স্থানে বোর্দোপেস্টের (১০০ গ্রাম চুন+১০০ গ্রাম তুতে+১ লিটার পানি) প্রলেপ দিতে হবে
- মুকুল বের হওয়ার প্রায় ৩ মাস পূর্বে (অর্থাৎ অক্টোবর মাসে) ন্যাপথালিন এসিটিক এসিড (NAA) শতকরা ০.০২ ভাগ হারে স্প্রে করলে রোগের তীব্রতা কমে যায়।

আমের কালো দাগ রোগ (Black spot disease of mango)

আমের কালো দাগ রোগ এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া (*Xanthomonas axonopodis pv. mangiferae indica*) দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে আমে ও পাতায় অসংখ্য পানি ভেজা দাগের সৃষ্টি হয়। পাতা, কান্ড ও ফলে এ রোগের আক্রমণে কালো দাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে আক্রান্ত দাগগুলো আরো বড় হয় এবং কোন কোন সময় ঐ স্থানটি ফেটে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- আক্রান্ত ডাল-পালা নিয়মিতভাবে ছাঁটাই করে দিতে হবে
- বেশি আক্রান্ত ফল গাছ থেকে অপসারণ করতে হবে
- রোগের আক্রমণ দেখা দিলেই কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন: জিবাল বা ব্লিটক্স বা অন্য নামের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ভালোভাবে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

চিত্র: আমের কালো দাগ রোগাক্রান্ত আম

আমের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় সমস্যা এবং ব্যবস্থাপনা

আমাদের দেশে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণসহ বেশ কিছু বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় সমস্যা (Physiological disorder) দেখা যায় যা আমের ফলনে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। আমের উৎপাদন বাড়াতে হলে উক্ত শারীরবৃত্তীয় সমস্যাসমূহ সমাধান করা প্রয়োজন। আমের প্রধান শারীরবৃত্তীয় সমস্যা এবং এর দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আমের আগা কালো, সরু বা চিকন হওয়া (Black tip)

চিত্র: আমের আগা কালো হওয়া

এটি আমের অন্যতম প্রধান শারীরবৃত্তীয় সমস্যা। সাধারণত, ইটভাটা বা অটো রাইস মিল সংলগড়ব এলাকার আম গাছে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ফলে ধারণা করা হয়, ইটভাটা বা রাইস মিলের ধোঁয়ার কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। গত কয়েক বছর যাবৎ এটি একটি আলোচিত সমস্যা এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমের মৌসুমে এই সমস্যার খবর বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে। চাষিদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে আমের গুটির বয়স ৩০-৪৫ দিন হলে এই সমস্যাটি শুরু হয় এবং পরিপক্ব আমে এটি দৃশ্যমান হয়। এই সমস্যাটি শুরু হলে তা দমনের তেমন কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই সমস্যাটি শুরু হওয়ার আগেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইটভাটাযুক্ত স্থানে এই সমস্যাটি পরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। তবে নিম্নের ব্যবস্থাপনাসমূহ গ্রহণ করলে সমস্যাটির প্রাদূর্ভাব অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে।

করণীয়সমূহ

- আমের আগা কালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে গুটি ধরার ৩০-৪০ দিন পর থেকে প্রতি লিটার পানিতে ৬ গ্রাম হারে বোরিক এসিড মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ৩-৪ বার সমগ্র গাছে স্প্রে করতে হবে
- আমের গুটির বয়স ৪০ দিন হলে প্রত্যেকটি আম ফ্রুট ব্যাগ দ্বারা আবৃত করতে হবে বা ব্যাগিং করতে হবে
- ইটভাটা হতে কমপক্ষে দুই কিলোমিটার দূরে নতুনভাবে আমবাগান স্থাপন করতে হবে। দেখা গেছে ইটভাটার চিমনির উচ্চতা ৩৮ মিটার বা ১২৫ ফুটের অধিক থাকলে সমস্যাটি কম হয়। তাই ভাটা মালিকদের তাদের ইটভাটার চিমনির উচ্চতা কমপক্ষে ৩৮ মিটার করতে বাধ্য করতে হবে
- আমের বর্ধনশীল পর্যায়ে ইটভাটা বন্ধ রেখে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব
- আমবাগান সমৃদ্ধ এলাকায় ইট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে। ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ মেনে চলতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির ভাটা যেমন: হাইব্রিড হফম্যান কিল্ন, টানেল কিল্ন, ভার্টিক্যাল শ্যাফট কিল্ন, জিগজ্যাগ কিল্ন প্রভৃতি স্থাপনের মাধ্যমে আমের ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব।

আমের পাতা পোড়া (Tip burn)

চিত্র: আমের পাতা পোড়া রোগ

সাধারণত পটাশিয়ামের অভাব, লবণের আধিক্য বা মাটিতে রসের অভাবে আমগাছে পাতা পোড়া লক্ষণ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে বয়স্ক পাতার আগা এবং কিনারা পুড়ে যায়। আক্রমণ বেশি হলে ধীরে ধীরে সমগ্র পাতা বাদামী হয়ে যায় এবং পাতার কিনারা মুড়িয়ে আসে। লবণাক্ত মাটি বা মাটিতে লোনা পানির কারণে, দীর্ঘ শুষ্কতা বা পানির অভাবে, তীব্র পটাশিয়ামের ঘাটতিতে আমগাছে পাতা পোড়া লক্ষণ দেখা দেয়। মিউরে অব পটাস সারের অধিক ব্যবহারেও পাতা পোড়া রোগ হতে পারে।

প্রতিকার: পটাশিয়ামের উৎস হিসেবে পটাশিয়াম সালফেট সার ব্যবহার করতে হবে। তীব্র অবস্থায় নতুন গজানো পাতায় ৪-৫ বার পটাশিয়াম সালফেট (৫%) ১৫ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

স্পঞ্জি টিস্যু (Spongy tissue)

চিত্র: আমের স্পঞ্জি টিস্যু

এ ক্ষেত্রে আম পাকার সময় আমের শাঁসের মধ্যে হলদে, অম্লস্বাদযুক্ত স্পঞ্জের মত (বায়ুকুঠুরীসহ অথবা ছাড়া) টিস্যু তৈরি হয়। এতে আমের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় এবং খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পরে। ফলের বৃদ্ধি বা পাকার সময় বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও পাকা ফল কাটলে স্পঞ্জি টিস্যু দেখা যায়। পুষ্টিগত অসামঞ্জস্যতা, অতিরিক্ত পাকিয়ে ফল সংগ্রহ করা, আম পাড়ার পর রোদে রাখা বা মাটির উর্ধ্বমূখী তাপমাত্রার কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু জাতের আম এ সমস্যার প্রতি অধিক সংবেদনশীল।

প্রতিকার

- পূর্ণ পরিপক্ব আমের তুলনায় ৮০/৮৫ ভাগ পরিপক্ব আম সংগ্রহ করা
- সংগ্রহের পর ছায়া যুক্ত স্থানের ছড়িয়ে রেখে আমের তাপমাত্রা প্রশমন করা
- মাটির তাপমাত্রা প্রশমনে সেচ প্রয়োগ এবং খড় বা শুকনা কচুরীপানা দ্বারা মাল্চ দেয়া
- গাছে অতিরিক্ত ইউরিয়া সার প্রয়োগ না করা এবং মিউরেট অব পটাসের পরিবর্তে পটাশিয়াম সালফেট সার ব্যবহার করা
- আমের যে জাতগুলোতে এই সমস্যা বেশি হয় সেগুলো পরিহার করা।

আম ফেটে যাওয়া (Fruit cracking)

চিত্র: আম ফেটে যাওয়া

ফল ধারণের পরবর্তী কয়েক মাস (মার্চ, এপ্রিল এবং মে) সাধারণত তাপমাত্রা বেশি থাকে এবং বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। ফলের বৃদ্ধিকালে দীর্ঘ শুষ্কতা বা পানির কমতি হলে ফলের ত্বক শক্ত হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ অধিক বৃষ্টি বা পানি পেলে ফলের ভিতরের অংশ দ্রুত বৃদ্ধি পায়,

এতে ভেতরের চাপ সহ্য করতে না পেরে আমের খোসা ফেটে যায়। আম মার্বেল আকার থেকে শুরু করে সংগ্রহ করা পর্যন্ত এই ফাটা অব্যাহত থাকে। পাহাড়ী জেলাগুলোতে এবং বরেন্দ্র অঞ্চলে এই সমস্যাটি বেশি দেখা যায়।

ব্যবস্থাপনা

- মাটিতে জৈব সার (পচা গোবর/সরিষার খৈল) প্রয়োগ করতে হবে
- ফেটে যাওয়া প্রতিরোধী জাতের চাষাবাদ করতে হবে
- আম মটরদানাকৃতি মত হলে প্রতি লিটার পানিতে ৬ গ্রাম হারে বোরিক এসিড মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করা
- সেচ প্রদানের পর পর গাছের গোড়ায় মাল্চ ব্যবহার করে সাফল্য জনকভাবে আম ফেটে যাওয়া রোধ করা যায়
- যে সমস্ত গাছে ফল ফেটে যাওয়া সমস্যা বেশি সেগুলোতে বর্ষার শেষে অন্যান্য সারের সাথে গাছ প্রতি ৫০ গ্রাম হারে বোরিক এসিড অথবা ১০০ গ্রাম হারে বোরাক্স সার প্রয়োগ করে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

একান্তরক্রমিক ফল ধারণ (Alternate bearing habit)

একান্তরক্রমিক ফল ধারণ বাণিজ্যিকভাবে আম চাষের একটি প্রধান সমস্যা। আমাদের দেশে চাষযোগ্য অধিকাংশ বাণিজ্যিক জাত যেমন খিরসাপাত, গোপালভোগ, ল্যাংড়া, আশ্বিনা, ফজলি ইত্যাদি জাত ফলধারণে একান্তরক্রমিক স্বভাব প্রদর্শন করে। তবে কোন গাছে এক বছর প্রচুর আম ধরলে স্বাভাবিকভাবেই অন্য বছর কম আম ধরে। একান্তরক্রমিক ফল ধারণের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো কৌলিতাত্ত্বিক বা বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট, বিরূপ আবহাওয়া, বিটপের আকার ও বয়স, গাছের শরীরে কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত, হরমোনগত অসাম্যতা, সুষ্ঠু কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যার অভাব, অতিরিক্ত ফল ধারণ ইত্যাদি। একান্তরক্রমিক ফল ধারণ রোধকল্পে কিছু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনা

- নিয়মিত ফল ধারণ করে এমন জাতের নির্বাচন করতে হবে। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতগুলো নিয়মিত ফল ধারণ করে
- সময়মত যথাযথভাবে কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যাসমূহ সম্পাদন করতে হবে
- অন ইয়ারে গাছের সবদিক হতে ৫০ ভাগ পুষ্পমঞ্জুরী ভেঙ্গে দিলে অফ ইয়ারে ফলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়
- অফ ইয়ারে সঠিক সময় ও সঠিক মাত্রায় কালটার (প্যাকলোবিউট্রাজল) প্রয়োগের মাধ্যমে অফ ইয়ারে আমের ফলন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশ আম উৎপাদনে কালটার ব্যবহার করছে। কালটার গাছের বৃদ্ধি নিরোধক একটি রাসায়নিক দ্রব্য, যা আমগাছের জাহিক বৃদ্ধিকে দমিয়ে রেখে ফুল ও ফল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করে। আম উৎপাদনে এদেশে কালটার বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কালটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাছের বয়স অনুযায়ী মাত্রা, সেচ ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় গাছের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।

আমের মাঠ পর্যায়ে বিরাজমান কিছু সমস্যা ও এর সমাধান

আম চাষাবাদে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায়। সঠিক সময়ে উক্ত সমস্যাসমূহের সমাধানে ব্যর্থ হলে আমের ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এ সকল সমস্যা সমাধানে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ বা সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে। নিম্নে আমবাগানে মাঠ পর্যায়ে বিরাজমান কিছু সমস্যা ও এর সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আমের গুটি ঝরা সমস্যা ও করণীয়

চিত্র: আমের গুটি ঝরা

বাণিজ্যিকভাবে আম চাষাবাদে উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে চাষিরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন আমের গুটি ঝরা তার মধ্যে অন্যতম। তবে সঠিক বাগান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই সমস্যাটি মোকাবেলা করা যায়। মোটামুটি দুইটি বিষয়ে আগাম ধারণা থাকলে আমের গুটি ঝরা কমানো যায়। প্রথমটি হলো কখন গুটি ঝরে আর দ্বিতীয়টি হলো কি কারণে আমের গুটি ঝরে। জাতগত বৈশিষ্ট, প্রাকৃতিক কারণ, মাটিতে আর্দ্রতার অভাব, অতিবৃষ্টি, রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ, কচি পাতার আধিক্য, গর্ভমুন্ডের নিম্ন পরাগগ্রাহীতা, বর্ধিষ্ণু ভ্রূণের পুষ্টিহীনতা, সুষম পুষ্টির অভাব, অসময়ে সার প্রয়োগ, দমকা বাতাস, শিলা বৃষ্টি, গাছের নিম্নতেজ ইত্যাদি কারণে আমের গুটি ঝরা সমস্যা দেখা দেয়। আমের গুটি ঝরা শুরু হলে তা বন্ধ করা কঠিন তবে সময়মত ব্যবস্থা নিলে আমের গুটি ঝরা কমানো সম্ভব। নিম্নে আমের গুটি ঝরার বিভিন্ন কারণ এবং এর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হল:

প্রাকৃতিক কারণ: সাধারণত আম গাছে প্রতি মুকুলে বা থোকায় জাতভেদে ১-৩০টি গুটি ধরে থাকে। গুটি ধারণের ৩০-৪৫ দিনের মধ্যেই প্রতি থোকায় ১-২টি গুটি থেকে অবশিষ্ট গুটিগুলো প্রাকৃতিক বা অভ্যন্তরীণ কারণেই ঝরে পড়ে। এটি গাছ তার ফল ধারণের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করার জন্যই করে থাকে।

প্রতিকার: আমের সুষম বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিকভাবে গুটি ঝরা প্রয়োজন। অতিরিক্ত গুটি ঝরে না পড়লে আমের আকার ছোট হয় এবং গুণগত মান ও ফলন কমে যায়। গবেষণার ফলাফল হতে দেখা গেছে, প্রতি মুকুলে ১টি করে গুটি থাকলেই সে বছরে আমের বাম্পার ফলন হয়ে থাকে। তবে কোন কোন জাতের ক্ষেত্রে প্রতি মুকুলে বা পুষ্পমঞ্জুরীতে একের অধিক আম ধরতে দেখা যায়।

খরাজনিত বা মাটিতে রসের অভাবজনিত কারণ: খরাজনিত বা মাটিতে রসের অভাবজনিত কারণেও আমের গুটি ঝরে পড়তে পারে। আমের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে মার্চ-এপ্রিল মাসে বৃষ্টিপাত কম হলে মাটিতে রসের অভাব দেখা দেয়। মাটিতে রসের অভাব হলে আমের বোঁটায় দ্রুত নির্মোচন স্তর (abscission layer) তৈরি হয়। যার ফলে আমের গুটি অস্বাভাবিক হারে ঝরে পড়ে।

প্রতিকার: মাটিতে রসের অভাবজনিত কারণে আমের গুটি ঝরে পড়লে সে ক্ষেত্রে করণীয় হলো নিয়মিত পানির সেচ প্রদান করা। আমের গুটি ধারণের পরপরই অর্থাৎ আমের গুটি মটর দানাকৃতি হলেই প্রথমে একবার গাছের গোড়ায় পানির সেচ দিতে হবে। প্রথম সেচ দেয়ার পর থেকে বৃষ্টিপাত না হওয়া পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর নিয়মিত পানির সেচ দিতে হবে। তবে আমগাছের গোড়ায় সেচকৃত অংশে মালচিং বা জাবড়া হিসেবে কচুরীপানা ব্যবহার করলে মাসে একবার সেচ দেয়াই যথেষ্ট। তবে সেচ প্রদান সুবিধা না থাকলে শুধু পানি স্প্রে করেও আমের গুটি ঝরা কমানো যায়। তবে সেক্ষেত্রে আমের গুটি মটরদানাকৃতি হলে প্রতি সপ্তাহে একদিন সকালে পানি স্প্রে করতে হবে। এই সময়ে এক বা দুইবার ভালো বৃষ্টিপাত হলে পানি স্প্রের প্রয়োজন হয় না। উল্লেখ্য যে, হঠাৎ করে প্রখর রৌদ্রে আমবাগানে সেচ না দেওয়াই উত্তম।

সেচের পাশাপাশি রাসায়নিক দ্রব্য বা হরমোন প্রয়োগ করেও আমের গুটি ঝরা কমানো যায়। যেমন- আমের গুটি মটর দানা আকৃতি হলে প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ইউরিয়া সার অথবা ন্যাফথাইল এসিটিক এসিড ১২ পিপিএম হারে (NAA @12 ppm) মিশিয়ে হালকা সূর্যের আলোতে আমের গুটিতে স্প্রে করলে আমের গুটি ঝরা কমে যায়। হরমোন স্প্রে করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কোনক্রমেই প্রখর সূর্যালোকে হরমোন স্প্রে করা যাবে না।

রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণজনিত কারণ: রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণে আমের গুটি ঝরে পড়তে পারে। হপার পোকা, পাউডারি মিলডিও, এ্যানথ্রাকনোজ প্রভৃতি রোগের আক্রমণে আমের ফুল ও গুটি ঝরে পড়ে।

প্রতিকার: রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণে আমের মুকুল ও গুটি ঝরে পড়লে আমগাছ ও আমবাগান সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গাছে কোন অবস্থাতেই মরা ও রোগাক্রান্ত ডাল-পালা রাখা যাবে না। বছরে দুইবার মরা ও রোগাক্রান্ত ডাল পালা ছাঁটাই করতে হবে। আমের মুকুল বের হবার পর কিন্তু ফুল ফোটার আগে হপার পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক কনফিডর ৭০-ডব্লিউজি বা একই গ্রুপের অন্য কীটনাশক ০.২ গ্রাম এবং এনথ্রাকনোজ ও পাউডারি মিলডিও রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা একই গ্রুপের অন্য ছত্রাকনাশক ২.০ গ্রাম এক সাথে মিশিয়ে ১ম বার এবং আম মটর দানার মত হলে দ্বিতীয় স্প্রে করতে হবে। এতে কচি আম ঝরে পড়া হ্রাস পাবে।

আমের মহালাগার কারণ এবং রক্ষা পাওয়ার জন্য করণীয়

মহালাগা আসলে কোন রোগ নয় বরং এটি পোকা ও রোগের আক্রমণের সমষ্টিগত ফলাফল। জানুয়ারী-মার্চ মাসে মহালাগার প্রাদূর্ভাব বেশি থাকে তবে এপ্রিল মাসেও মহালাগা ঘটতে পারে। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া এর দ্রুত বিস্তারে সহায়তা করে। আমবাগানে মুকুল বা পুষ্পমঞ্জুরী বের হওয়ার সময় দিন ও রাতের গড় তাপমাত্রা ২৫° সে. এর মধ্যে থাকলে মহালাগার সম্ভাবনা কম থাকে তবে এই

চিত্র: মহালাগা আক্রান্ত মুকুল

সময়ে তাপমাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে (৩০° সে.) আমবাগানে হপার পোকার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এই সময়ে ঘন ঘন বাগান পরিদর্শন করতে হবে। বাগানে হপার বা শোষক পোকা দেখা দিলে তা দমনে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই পোকার আমের মুকুল থেকে রস চুষে খায় ফলে মুকুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষণ করে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয় যা মধুরস বা হানিডিউ (Honeydew) নামে পরিচিত। আঁঠালো হওয়ায় এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে। এতে শুটিমোল্ড নামক এক প্রকার ছত্রাক জন্মায়। এই ছত্রাকের কারণে আমের মুকুল, ফুল ও পাতার উপর কালো রঙের আবরণ পড়ে যা মহালাগা নামে পরিচিত। এর কারণে গাছের সালোকসংশ্লেষন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং গাছ দূর্বল হয়ে পড়ে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- আমবাগানে মুকুল বা পুষ্পমঞ্জুরী বের হওয়ার আনুমানিক ১৫-২০ দিন পূর্বে সাইপারমেথ্রিন অথবা কার্বারিল গ্রুপের যে কোন কীটনাশক দ্বারা ভালোভাবে সমস্ত গাছ ধুয়ে দিতে হবে
- হপার পোকা অন্ধকার বা বেশি ছায়াযুক্ত স্থান পছন্দ করে। তাই নিয়মিতভাবে গাছের ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে যাতে গাছের মধ্যে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে
- অমের মুকুল যখন ১০-১২ সেন্টিমিটার হয় অর্থাৎ ফুল ফোটার পূর্বে তখন একবার এবং আম যখন মটর দানাকৃতি হয় তখন আর একবার ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক কনফিডর ৭০ ডব্লিউজি বা একই গ্রুপের অন্য কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম হারে ভালোভাবে মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছে স্প্রে করতে হবে
- আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড বা ঝুল রোগের আক্রমণ ঘটে। ফলে এ রোগ দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক হপার পোকা দমনের জন্য ব্যবহার্য কীটনাশকের সাথে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। তবে মহালাগা দমনের ক্ষেত্রে প্রতিষেধক ব্যবস্থার চেয়ে প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেওয়াই উত্তম।

অপরিকল্পিত ও অধিক ঘন বাগান ব্যবস্থাপনা

আম এদেশের মানুষের সবচেয়ে পছন্দনীয় ফল। সারা বছর চাহিদানুযায়ী ফল খেতে না পেলেও আমের মৌসুমে তা সাধ্যমতো পুষিয়ে নেন ভোক্তারা। এই চাহিদা পূরণে দেশের ২৩টি জেলায় আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে বিগত কয়েক বছর ধারাবাহিকভাবে আমের উৎপাদন বেড়েছে। তারপরও নতুন বাগান স্থাপনে থেমে নেই। তবে নতুন ভাবে আমবাগান স্থাপনের জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিকল্পনা বিশেষত বাগানের নকশা ও রোপণ দূরত্ব অনুসরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু অনেক নতুন বাগানি অপরিকল্পিতভাবে অনেক ঘন ভাবে গাছ রোপণ করে। সরেজমিনে বাগান পরিদর্শন করে দেখা গেছে, নতুন বাগানে রোপণের নির্ধারিত দূরত্ব অনুসরণ না করে ঘন ও অতি ঘনভাবে আমগাছ রোপণ করা হয়েছে। ফলে গাছ রোপণের ৩-৪ বছরের মধ্যেই একটি গাছ অন্য গাছের ভিতরে প্রবেশ করেছে। এসব আমবাগানে ৩-৪ বছর পর ফলন বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে ফলন হ্রাস পাচ্ছে। আম গবেষক ও আম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মনে করেন, নতুন বাগান স্থাপনের পূর্বে চাষিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরিকল্পিত ও অধিক ঘন বাগান থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই নজর দিতে হবে-

বাগান ব্যবস্থাপনা

- দুটি গাছের মাঝের দূরত্ব ৩ মিটার বা তার কম হলে দুইটি গাছের মধ্যে একটি গাছ কেটে ফেলতে হবে
- প্রতি বছর গাছের বয়সানুযায়ী সুপারিশকৃত সারের দেড় থেকে দুইগুণ সার প্রয়োগ করতে হবে। শুধুমাত্র রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করে সাথে পচা গোবর/জৈবসার/ভার্মিকম্পোস্ট/ট্রাইকোকম্পোস্ট/আবর্জনা পচা সার ব্যবহার করতে হবে
- আম সংগ্রহ করার পরপরই গাছে প্রুনিং করতে হবে। রোগাক্রান্ত, মরা ও অধিক ঘন ডাল পালা ছেঁটে দিতে হবে
- নতুন পাতা বের হলে এ্যানথ্রাকনোজ রোগ এবং পাতাকাটা উইভিল পোকা দমনের জন্য কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক ও মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতিলিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে একত্রে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে
- খরা মৌসুমে এবং সার প্রয়োগের পর পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

মল্লিকা জাতের আম চাষে সমস্যা ও সমাধান

চিত্র: আমের নিম্নপ্রান্ত হলুদ হওয়া

মল্লিকা জাতটি ভারতের উদ্ভাবিত একটি সংকর জাত। Neelum ও Dashehari জাতের সংকরায়নের ফলে উচ্চ ফলনশীল এই জাতটির উদ্ভাবন হয়। তারপর এটি বাংলাদেশে আসে। আমের গুণগতমান, আকার, বর্ণ, গন্ধ, মিষ্টতা এবং সংরক্ষণকাল সবকিছু মিলিয়ে এটি একটি ভালো জাত। তবুও গবেষণায় জাতটিতে বেশ কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হওয়ায় এটি এখনো জাত হিসেবে এ দেশে চাষের জন্য অনুমোদিত হয়নি। বাগান আকারে এখনও জাতটির তেমন সম্প্রসারণ না হলেও কিছু বাগানে অন্যান্য জাতের সাথে চাষ করা হচ্ছে। জাতটির ফলন নিয়ে তেমন কোন সমস্যা নেই। তবে জাতটিতে গুটি বাঁধার ৫০-৬০ দিন পর আমের নিম্ন প্রান্তে হলুদ বর্ণের দাগ দেখা যায়। পরে ক্রমান্বয়ে দাগটি কালো বর্ণে রূপ নেয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পচন দেখা যায় এবং আমগুলোর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, আকারে ছোট হয় এবং অনেক সময় ঝরে পড়ে। গৌণ পুষ্টি উপাদান বোরণের অভাবে এমনটি হয় বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। এ সমস্যার সমাধানে আম সংগ্রহের পর সুষম সার ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। দশ বছরের একটি গাছে গোবর সার ৫০-৬০ কেজি, ইউরিয়া সার ১২৫০ গ্রাম, টিএসপি সার ১০০০ গ্রাম, এমপি সার ১০০০ গ্রাম, জিপসাম ৭৫০ গ্রাম, জিংক সালফেট ৫০ গ্রাম এবং বোরিক এসিড ৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও আমের আকার মটরদানা থেকে শুরু করে মার্বেল আকার হওয়া পর্যন্ত ৬০ গ্রাম বোরিক পাউডার ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে ভালো ফল পাওয়া গেছে। খরা মৌসুমে অর্থাৎ মার্চ-মে মাস পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর অন্তর সেচের ব্যাবস্থা করতে হবে। তবে আম গাছের গোড়ায় মালচিং বা জাবড়া প্রয়োগ করলে মাসে একবার সেচ দিলেই চলবে। সাধারণত যে সব এলাকার মাটিতে গৌণ পুষ্টি উপাদান বোরণের ঘাটতি আছে বা গাছের বোরন গ্রহণজনিত সীমাবদ্ধতা আছে সেখানে এই সমস্যাটি বেশি দেখা যায়। সুতরাং সুষম সার ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ গোবর সার বা জৈব সার, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বোরিক এসিড ব্যবহারে এই সমস্যাটি সমাধান করা যায়। তবে শুষ্ক মাটি ও পাহাড়ী এলাকায় এই জাতটি চাষ করা হলে গাছের গোড়ায় মালচ বা জাবড়া প্রয়োগ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। যে সব এলাকার মাটিতে বোরনের ঘাটতি বেশি এবং আমের বর্ধনশীল সময়ে অর্থাৎ মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত মাটিতে রসের অভাব দেখা দেয় সে সব জায়গায় এই জাতটি চাষাবাদ না করাই উত্তম।

বালাইনাশক ব্যবহারের নীতিমালা ও আবশ্যিক বিষয়সমূহ

ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদনে বালাইনাশকের ব্যবহার কৃষিতে নতুন কোন বিষয় নয়। এদেশে উষ্ণ ও অব-উষ্ণ মন্ডলের আবহাওয়া বিরাজমান এবং জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই এর প্রদূর্ভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। তাই ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদনে এগুলোর দমন অনেকাংশেই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি হয়ে পড়ে। আম এদেশে চাষযোগ্য প্রধান অর্থকরী ও জনপ্রিয় একটি ফল। তবে সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো পছন্দনীয় এই ফলটি উৎপাদনের জন্য বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ও যথেচ্ছ ব্যবহার। গত কয়েক বছর আগেও যে সকল বাগানে বছরে ২-৩ বার বালাইনাশক ব্যবহার করা হতো বর্তমানে সেখানে ২০-৩০ বার বালাইনাশক স্প্রে করা হয়। আমের মৌসুম শুরুর আগে থেকেই ধুম পড়ে যায় গাছে গাছে বালাইনাশকের স্প্রে। কিছু চাষি প্রয়োজনে স্প্রে করলেও অধিকাংশই শুরু করেন অন্যের দেখাদেখি। বর্তমানে আমবাগানে শুরু হয়েছে নতুন এক বালাই ব্যবস্থাপনা যা ককটেলের নামে পরিচিত। এই ককটেলে একাধিক কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও হরমোন একত্রে মিশ্রিত করে ব্যবহার হয়ে থাকে। যদিও গবেষকদের মতে, এই ধরণের ককটেল কখনও কার্যকরী হতে পারে না। তাদের মতে বালাইনাশক ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে অবশ্যই স্প্রের মূলনীতি ভালোভাবে জানা এবং তা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

চিত্র: আম বাগানে স্প্রে

বালাইনাশক স্প্রের মূলনীতি: বালাইনাশক স্প্রের সুফল পেতে হলে ৪টি (চার) মূলনীতি অবশ্যই মেনে চলা উচিত। এগুলো হলো– সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন, সঠিক ডোজ বা মাত্রা নির্ধারণ, সঠিক সময় নির্বাচন এবং সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ।

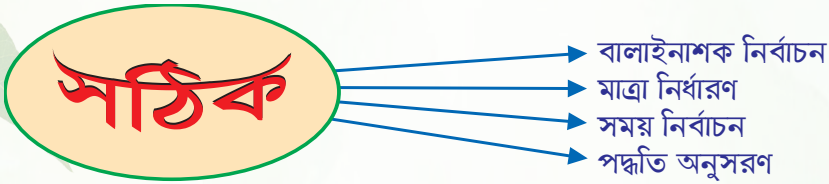

সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন: আমের রোগ বা পোকা লাভজনকভাবে ও কম খরচে দমন করতে সঠিক ঔষধ নির্বাচন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ঔষধ নির্বাচনে ভুল হলে স্প্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

অনেকে কীটনাশক ডিলারদের পরামর্শে বালাইনাশক ব্যবহার করেন, এটা ঠিক নয়। এ ব্যপারে সঠিক পরামর্শের জন্য কৃষি বিভাগ বা গবেষণা কেন্দ্রে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। একই বালাইনাশক ক্রমাগত ব্যবহার না করে মাঝে মাঝে গ্রুপ পরিবর্তন করা উচিত। কারণ একই ঔষধ বারবার স্প্রে করলে পোকা বা রোগ জীবাণু তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

সঠিক মাত্রা নির্ধারণ: সঠিক মাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বালাইনাশকের মাত্রা নির্দেশিত মাত্রার চেয়ে কম বা বেশি করা যাবে না। কম মাত্রায় বালাইনাশক স্প্রে করলে রোগ বা পোকামাকড় ভালোভাবে দমন হবে না। উপরন্ত রোগ জীবাণু বা পোকামাকড় বালাইনাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করবে। আবার অধিক মাত্রায় বালাইনাশকের ব্যবহারে অর্থের অপচয়ের পাশাপাশি গাছের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য বোতল বা প্যাকেটের গায়ে লিখিত নির্দেশনা, কৃষি বিজ্ঞানীদের বা কৃষি কর্মীর পরামর্শ মতো সঠিক মাত্রায় বালাইনাশক স্প্রে করতে হবে।

সঠিক সময় নির্বাচন: কথায় বলে, সময়ের এক ফোড় অসময়ের দশ ফোঁড়। তাই সঠিক সময়ে বালাইনাশক স্প্রে করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আম গাছে মুকুল আসার পর থেকে ফলধারণ পর্যন্ত সময়টুকু বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হলে আমগাছে ফলধারণ নাও করতে পারে। আমের মুকুল ১০-১২ সে. মি. হলেই কীটনাশক স্প্রে করা উচিত। আমের পরাগায়ন প্রধানত বিভিন্ন প্রজাতির মাছি, মৌমাছি ও পতঙ্গ দ্বারা হয়ে থাকে। তাই ফুল ফোটার সময় কীটনাশক স্প্রে করলে এরা মারা যেতে পারে এবং আমের পরাগায়ন ও ফল ধারণ ব্যাহত হতে পারে। গাছ থেকে ফল সংগ্রহের ১০-১৫ দিন পূর্ব থেকে গাছে বালাইনাশক ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ: সঠিক ঔষধ, সঠিক মাত্রা, সঠিক সময় ইত্যাদি নির্ধারণের পর সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। বালাইনাশক থেকে পরিপূর্ণ ফল পেতে হলে অবশ্যই সঠিক পদ্ধতিতে স্প্রে করতে হবে। ফলের মধ্যে বা ডালের ভিতরে ছিদ্রকারী পোকা অবস্থান করলে বাইরে কীটনাশক প্রয়োগে কোন লাভ হবে না। আমের হপার পোকা সুষ্ঠুভাবে দমন করতে হলে পাতায় স্প্রে করার সাথে সাথে গাছের গুড়িতেও স্প্রে করতে হবে। তাই সুষ্ঠুভাবে রোগ বা পোকা দমনের জন্য স্থানীয় কৃষি অফিস বা ফল বিজ্ঞানীদের পরামর্শ মোতাবেক বালাইনাশক স্প্রে করার সঠিক পদ্ধতি জেনে নেয়া উচিত।

অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয়, অসময়ে এবং ভুল পদ্ধতিতে বালাইনাশকের ব্যবহার যেমন: ফসলের উৎপাদনকে ব্যয়বহুল করে তেমনি সময় ও শ্রমের অপচয় ঘটায়। এছাড়াও নির্বিচারে বালাইনাশকের ব্যবহার আমাদের প্রকৃতিতে বিদ্যমান উপকারী ও বন্ধু পোকাকে ধ্বংস করে শত্রু পোকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অন্যদিকে পরাগায়নের সহায়ক কীট-পতঙ্গ ধ্বংসের ফলে উদ্ভিদের পরাগায়ন বাধাগ্রস্ত হয় এবং ফলধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। অধিক বালাইনাশক ব্যবহার করে উৎপাদিত ফল আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যে হুমকি সৃষ্টি করছে। এমতাবস্থায়, রোগ ও পোকামাকড় দমনে স্প্রের নিয়মনীতি অনুসরণ করে বালাইনাশক ব্যবহার করা অপরিহার্য।

গুণগত মানসম্পন্ন আম উৎপাদনে কতিপয় আধুনিক প্রযুক্তি

উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আজকের কৃষি, জীবিকা নির্বাহের স্তর থেকে বাণিজ্যিক স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং কৃষির বাণিজ্যিকীকরণে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল বিশেষ করে ফল ও সবজির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক চাষে যে ফসলটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে তা হচ্ছে আম। বাণিজ্যিকভাবে গুণগত মানসম্পন্ন আম উৎপাদনের জন্য উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা করে যাচ্ছে ও বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি

গুণগত মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও বিষমুক্ত ফল উৎপাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণা করে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছে। এই প্রযুক্তিটি বাংলাদেশে একটি নতুন ও সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি হিসেবে মাঠপর্যায়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। ফল বাগানে বালাইনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহারজনিত আতংকের বিপরীতে আম বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি শুধু পরিবেশ বান্ধবই নয় সাশ্রয়ী হিসাবেও প্রমাণিত। মাঠ পর্যায়ে বাণিজ্যিক আম উৎপাদনে চাষিদের বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রোগ, পোকামাকড় ও প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট সমস্যা। ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজেই এ সকল সমস্যার সমাধান করা যায়। ফ্রুট ব্যাগিং বলতে ফল গাছে থাকা অবস্থায় বিশেষ ধরনের ব্যাগ দ্বারা ফলকে আবৃত করাকে বুঝায় এবং এরপর থেকে ফল সংগ্রহ করার পূর্ব পর্যন্ত ফলটি ব্যাগের মধ্যেই গাছে লাগানো থাকে। এই ব্যাগ বিভিন্ন ফলের জন্য বিভিন্ন রং এবং আকারের হয়ে থাকে। তবে আমের জন্য দুই ধরনের ব্যাগ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রঙিন আমের জন্য সাদা রঙের ব্যাগ এবং অন্য সকল আমের জন্য দুই স্তর বিশিষ্ট বাদামি ব্যাগ। বর্তমানে আম চাষিরা দুই স্তরের বাদামি ব্যাগ বাণিজ্যিকভাবে আম উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করছেন। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত ফলসমূহ নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও রপ্তানি উপযোগী হয়।

চিত্র: ফ্রুট ব্যাগিংকৃত আমবাগান

ব্যাগিং করার উপযুক্ত সময়: প্রাকৃতিকভাবে গুটি ঝরা বন্ধ হলেই আমে ব্যাগিং শুরু করতে হয়। এই সময়ে আম জাতভেদে মার্বেল আকার বা তার চেয়ে একটু বড় হয়ে থাকে। সাধারণত বারি আম-১, ২, ৬, ৭, ১০, গোপালভোগ, খিরসাপাত, ল্যাংড়া এবং হিমসাগর ইত্যাদি জাতের ক্ষেত্রে গুটির বয়স ৪০-৪৫ দিন হলে ব্যাগিং শুরু করতে হয়। তবে বারি আম-৩, ৪, ৮, ফজলি, হাঁড়িভাঙ্গা, আশ্বিনা এবং বারি আম-১২ (গৌড়মতি) ইত্যাদি জাতের ক্ষেত্রে গুটির বয়স ৬০-৬৫ দিন হলেও ব্যাগিং করা যায়।

ব্যাগিং করার পূর্বে একটি কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় একত্রে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ব্যাগিং করার পূর্বেই গাছ থেকে মরা মুকুল বা পুষ্পমঞ্জুরীর অংশবিশেষ, রোগাক্রান্ত ফল ও পাতা অথবা এমন কিছু যা ফলের ক্ষতি করতে পারে সেগুলো অপসারণ করতে হবে।

ফ্রুট ব্যাগিং এর উপযোগিতা ও সুবিধা: শুধুমাত্র পারিবারিক চাহিদা পূরণে বা সখের বসে যে সকল আমগাছ লাগানো হয়েছে, এই সমস্ত গাছে সাধারণত সময়মতো স্প্রে করা হয় না। ফলে প্রতি বছর গাছে আম ধরলেও পোকা ও রোগের কারণে তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়। এসব আমগাছে এই প্রযুক্তিটি অত্যন্ত কার্যকর। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে প্রায় সব ধরণের এবং সারাদেশে নাবী জাতসমূহের, আম বিবর্ণ ও এর গায়ে কালো ছাপ পড়ে এবং মাছি পোকার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশ্বিনার মত নাবীজাতের আম মাছি পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায় এবং আমের গায়ে কালো দাগ পড়ায় বাজার মূল্য কমে যায়। এসব ক্ষেত্রে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে ফলের শতভাগ রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। রপ্তানির জন্য রোগ ও পোকামাকড় এবং বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশের প্রভাব মুক্ত মানসম্পন্ন ও রঙিন আম নির্বাচন করা হয়। ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহারে সবচেয়ে কম পরিমাণ বালাইনাশক ব্যবহার করে শতভাগ রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন করা সম্ভব। ফলে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনে ফ্রুট ব্যাগিং একটি কার্যকর প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি ব্যবহারে আমের সংরক্ষণকাল ১০-১৫ দিন বৃদ্ধি পায়।

চিত্র: ব্যাগিং করার উপযুক্ত আম

যে সমস্ত বাগানে ঘন করে গাছ লাগানো হয়েছে এবং বর্তমানে গাছ ও বাগানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারেনা সেখানে আমের মাছি পোকার আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মাছি পোকা দমনের জন্য যত ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা প্রচলিত আছে তার কোনটিই এই পোকা দমনে শতভাগ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি মাছি পোকা দমনে শতভাগ কার্যকর। এ প্রযুক্তি মাছি পোকার পাশাপাশি আমের সংগ্রহোত্তর রোগ নিয়ন্ত্রণেও যথেষ্ট সফল। আম রপ্তানির জন্য বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশের প্রভাব মুক্ত, মানসম্পন্ন রঙিন এবং রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ মুক্ত আম প্রয়োজন। প্রচলিত পদ্ধতিতে এই তিন বৈশিষ্টের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব নয়। একমাত্র ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি দ্বারা সবচেয়ে কম পরিমাণ বালাইনাশক ব্যবহার করে শতভাগ রোগ ও পোকামাকড় মুক্ত এবং মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও রঙিন আম উৎপাদন করা সম্ভব।

ব্যাগিং প্রযুক্তি হতে ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ-

- গুটির বয়স ৪০-৪৫ দিন হলে আম ব্যগিং করার উপযুক্ত হয়
- ব্যাগিং করার পূর্বে নির্দিষ্ট মাত্রায় কীটনাশক (কার্বারিল/সাইপারমেথ্রিন) ও ছত্রাকনাশক (কার্বেন্ডাজিম) একত্রে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ব্যাগিং করার কমপক্ষে ২-৩ ঘণ্টা পূর্বে স্প্রে করতে হবে। বৃষ্টিপাত না হলে স্প্রে করার পরের দিনও ব্যাগিং করা যাবে
- ফল ভেজা অবস্থায় ব্যাগিং করা উচিৎ নয়।

টিপ প্রুনিং (Tip pruning) প্রযুক্তি

সাধারণভাবে প্রুনিং বলতে আমরা যে কোন গাছের ডাল-পালা ছাঁটাইকরণকে বুঝে থাকি তবে টিপ প্রুনিং বলতে ডগার অগ্রভাগ কর্তনকে বুঝায়। টিপ প্রুনিং এর মাধ্যমে ফলের আকার ও গুণগতমান ভালো করা যায়। আমের ক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রযুক্তি। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন আম উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক দেশে গুণগত মানসম্পন্ন আম উৎপাদনে এই ধরনের প্রযুক্তি দীর্ঘদিন যাবত ব্যবহার হয়ে আসছে। বর্তমানে এদেশে আমের চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে বাড়ছে উৎপাদন এবং সুযোগ তৈরি হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের। প্রায় দুই দশক ধরে আমাদের দেশে বারি আম-৩ তথা আম্রপালি জাতটি বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়ে আসছে। সকলের পছন্দনীয় হওয়ায় এ জাতটির চাষাবাদ সারাদেশে দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। বাড়ির ছাদে টবে এবং ড্রামে বারি আম-৩ জাতটি সবচেয়ে বেশি চাষ হয়। এছাড়াও নওগাঁ, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বাণিজ্যিকভাবে এই জাতটি ব্যাপক চাষ হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বারি আম-৩ এর নতুন বাগানে ফল ছোট হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। আমের আকার ছোট হলে আমের চাহিদা ও গুণগত মান কমে যায় এবং বাজার মূল্য হ্রাস পায়। আম ছোট হওয়ার কারণ গাছে প্রচুর আম ধরা, গাছকে পর্যাপ্ত খাবার না দেয়া, সঠিক দূরত্বে চারা বা কলম রোপণ না করা সহ গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কারণে আমের আকার ছোট হয়ে থাকে।

চিত্র: টিপ প্রুনিং প্রযুক্তির বিভিন্ন ধাপ এবং এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত আম

আম সংগ্রহ করার পর পরই অথবা জুলাই মাসে আম গাছের প্রত্যেকটি ডগার শীর্ষ প্রান্ত হতে ৩০ সে. মি. বা ১ ফুট পর্যন্ত কেটে দিলে পরবর্তী বছরে ঐ গাছ হতে বড় আকারের ও গুনগত মানসম্পন্ন আম পাওয়া যায় (চিত্র-A)। ফলন বাড়ার কারণ হিসেবে দেখা গেছে, কর্তিত অংশ হতে ৩-৭ টি নতুন ডগা বের হয় (চিত্র- C & D) এবং নতুন শাখার বয়স ৫-৬ মাস হওয়ায় প্রায় প্রত্যেকটি শাখায় মুকুল আসে। তবে কর্তিত অংশের পরিমাণ বেশি হলে এবং আগস্ট মাসের পরে ডাল কাটলে পরের মৌসুমে এ জাতটিতে মুকুল নাও আসতে পারে। বর্তমানে বারি আম-৩ জাতটির ফলের ওজন স্থানভেদে ৬০-১৮০ গ্রাম পর্যন্ত হতে দেখা যাচ্ছে কিন্তু টিপ প্রুনিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে উক্ত জাতের আমের ওজন ২৫০-৪০০ গ্রামে উন্নীত করা সম্ভব। আমের আকার বড় হওয়ায় চাহিদা ও বাজারমূল্য বৃদ্ধি পাবে। আমগাছের বয়স ৫ বছর হলে এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা যাবে এবং ৪০ বছর পর্যন্ত ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। তবে প্রতি বছর প্রুনিং না করে ৩ বছর পর পর প্রুনিং করলেই চলবে।

প্রযুক্তিটির অন্যান্য সুবিধাসমূহ

- আমের আকার ও গুনগতমান বৃদ্ধির ফলে আমের ফলন বৃদ্ধি পাবে
- বারি আম-৩ এ পাতার লাল মরিচা রোগ (red rust) একটি বড় সমস্যা। কোন প্রকার ছত্রাকনাশক প্রয়োগ ছাড়াই প্রতিবার টিপ প্রুনিং এর মাধ্যমে প্রায় দুই বছর পর্যন্ত রোগটি দমনে রাখা যায়
- টিপ প্রুনিংকৃত আমবাগানে ১৫-২০ বছর পর্যন্ত বিভিনড়ব সাথি ফসল চাষ করা যায়
- টিপ প্রুনিং প্রযুক্তি ব্যবহারে গাছের কান্ড, গোড়া ও মাটিতে সরাররি সূর্যের আলো প্রবেশ করায় পোকার ডিম ও রোগের জীবাণু ধ্বংস হয় ফলে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়
- বর্তমানে ঘন করে গাছ রোপণের ফলে যারা কাঙ্ক্ষিত ফলন পাচ্ছেন না তাদের জন্য এই প্রযুক্তিটি অত্যন্ত সহায়ক হবে
- টিপ প্রুনিং এর ফলে গাছের আকার ছোট থাকে এবং সুন্দর ক্যানোপি তৈরির ফলে বাগান ব্যবস্থাপনা সহজ হয়
- ছাঁটাইকৃত ডালপালা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়সমূহ

প্রুনিং করার পর পরই গাছের বয়স অনুযায়ী সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। আম সংগ্রহ করার পর পরই অথবা জুলাই-আগস্ট মাসের মধ্যে প্রুনিং করতে হবে। অক্টোবর মাস বা তার পরে প্রুনিং করা না করা উত্তম। এতে গাছে মুকুলের সংখ্যা কমে যেতে পারে বা মুকুল নাও আসতে পারে। গছে নতুন ডগা বা কুশি বের হলে মেনকোজেব বা টেবুকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক এবং আমের পাতা কাটা উইভিল এর আক্রমণ দেখা দিলে কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

অতি ঘন পদ্ধতিতে আমবাগান স্থাপন (Ultra-high density mango plantation)

নদীমাতৃক এই দেশ আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও জনসংখ্যায় ভরপুর। বিশ্বের ৮ম ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১১২৫ জন লোক বাস করে। এ ছাড়াও প্রতিদিন যোগ হচ্ছে নতুন নতুন মুখ। ফলে এসব জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বাড়তি খাদ্যশস্য ও ফলমূল। সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ ও দিক নির্দেশনায় আজ এ দেশ দানাজাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এদেশের মানুষের সবচেয়ে পছন্দনীয় ফল হলো আম। সারা বছর চাহিদানুযায়ী ফল খেতে না পেলেও আমের মৌসুমে ভোক্তারা তা সাধ্যমতো পুষিয়ে নেন। ফলে বিগত কয়েক বছর ধারাবাহিকভাবে আমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে ২৩টি জেলায় আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ সম্প্রসারিত হয়েছে এবং প্রতি বছর নতুন নতুন বাগান স্থাপন হচ্ছে। তবে নতুনভাবে আমবাগান স্থাপনের জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিকল্পনা বিশেষত: নকশা ও রোপণ দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা। আমাদের দেশে আম চাষের অনুমোদিত রোপণ দূরত্ব হচ্ছে ৮-১০ × ৮-১০ মিটার। এতে প্রতি হেক্টরে ১০০ থেকে ১৫৬টি গাছের সংকুলান হয়। জমির সীমাবদ্ধতা ও অল্প জমি হতে অধিক পরিমাণে ফলন পাওয়ার জন্য

উন্নত দেশসমূহে অনুসরণ করা হচ্ছে আলট্রা হাই ডেনসেটি প্লান্টিং (অতি ঘন পদ্ধতিতে গাছ রোপণ) পদ্ধতির। এ পদ্ধতিতে আম বাগানের জন্য লাইন হতে লাইনের দূরত্ব দেয়া হয় ৩ মিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব দেয়া হয় ২ মিটার। ফলে এক হেক্টর জমিতে ১৬৬৭টি গাছ লাগানো সম্ভব হয়। অর্থাৎ অতি ঘন পদ্ধতিতে সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে ১০ থেকে ১৭ গুণ বেশি গাছ রোপণ করা সম্ভব হয়। এতে প্রতি একক জমিতে ৮ থেকে ১০ গুণ অধিক ফলন পাওয়া যায়। তবে অতি ঘন পদ্ধতিতে আমবাগান করলে আমবাগান ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য এবং চাষিদের এই বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, অল্প সময়ে ফলের চাহিদা মেটাতে ও আমের ফলন বৃদ্ধিতে এই ধরনের উদ্যোগ যুক্তিসংগত হলেও সঠিক নিয়ম-কানুন না জেনে অতি ঘন পদ্ধতিতে আমবাগান করলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। পরিকল্পিতভাবে অতিঘন পদ্ধতিতে আমবাগান স্থাপনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই নজর দিতে হবে।

চিত্র: অতি ঘন পদ্ধতিতে স্থাপিত আমবাগান

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- এ পদ্ধতির জন্য সঠিক জাত নির্বাচন করতে হবে
- প্রতি বছর গাছের বয়সানুযায়ী নির্ধারিত মাত্রার দুই থেকে তিন গুণ সার প্রয়োগ করতে হবে। স্লো রিলিজিং ফার্টিলাইজার এ পদ্ধতির জন্য অত্যন্ত উপযোগি। শুধুমাত্র রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে সাথে জৈবসার ব্যবহার করতে হবে
- প্রতি বছর আম সংগ্রহের পর গাছের রোগাক্রান্ত, মরা ও অধিক ঘন ডালপালা প্রুনিং করতে হবে। প্রতি তিন বছর পর পর ভারী ছাঁটাই (Hard pruning) করতে হবে
- নতুন পাতা বের হলে এ্যানথ্রাকনোজ রোগ এবং পাতা কাটা উইভিল পোকার আক্রমণ দেখা যায় সেক্ষেত্রে নির্ধারিত মাত্রায় কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক ও মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক একসাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে
- অতি ঘন পদ্ধতিতে স্থাপিত আমবাগানে পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ করতে পারে না। ফলে হপার ও মাছি পোকার উপদ্রব বেশি হয়ে থাকে। সেজন্য নিয়মিত ইমিডাক্লোপ্রিড/কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে এবং সঠিক সময় ও পদ্ধতিতে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে
- খরা মৌসুমে এবং সার প্রয়োগের পর প্রয়োজনে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে
- অতি ঘন পদ্ধতিতে আমবাগানে নিবিড় পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য। এ পদ্ধতিতে স্থাপিত বাগানে সাধারণ পদ্ধতিতে সার ও সেচ প্রয়োগ না করে ফার্টিগেশন পদ্ধতি অনুসরণ করা অধিক কার্যকর
- এ ছাড়াও আমবাগানে অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেজন্য আম গাছের পরিচর্যার মাস-পঞ্জিকা অনুসরণ করতে হবে।

টবে আম উৎপাদন পদ্ধতি

ছাদবাগানের মতো বাড়ির আঙ্গিনাতেও টব স্থাপন করে বিভিন্ন জাতের আম চাষ করা সম্ভব। টবে আম চাষের জন্য টিনের ড্রামের চাইতে খোয়া (ইটের টুকরা), সিমেন্ট, বালি ও চিকন রডের তৈরী কংক্রিটের টব সর্বোত্তম এবং এতে অনায়াসেই ১০-১২ বছর আম চাষ করা সম্ভব। আম চাষের জন্য টবের আকার ৩২×৩২×৩০ ইঞ্চি (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা) হলে ভালো হয়। টবের উপরের প্রান্তে ৪ ইঞ্চি পাড় বা কিনারা রাখলে দেখতে সুন্দর হয়। টবটি ভালোভাবে স্থানান্তরের জন্য চার প্রান্তে ৪টি হুক রাখতে হবে। টবটির নিচের প্রান্তে ৩ টি পানি নিষ্কাশনের জন্য ছিদ্র রাখতে হবে। পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য টবটি ভরাট করার সময় এর তলায় ২/৩ ইঞ্চি পুরু করে ইটের খোয়া বিছিয়ে দেয়া প্রয়োজন। টব ভরাটের জন্য ৫০ ভাগ দোঁআশ মাটি এবং ৫০ ভাগ পচানো গোবর অথবা জৈব সারের মিশ্রণ ব্যবহার করলে ভালো হয়। এরপর পছন্দনীয় জাতের আমের কলম সংগ্রহ করে লাগাতে হবে। টবে জন্মানোর জন্য নিচের দিকে বা মাটির কাছাকাছি গ্রাফটিং করা চারাগুলো উত্তম। এ জন্য এমন চারা নির্বাচন করতে হবে যাতে চারার গোড়া থেকে ৫-৮ ইঞ্চি উপরে গ্রাফটিং করা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় সব টবগুলো পাশাপাশি রাখলেই চলবে। এক-দুই বছর পর নির্দিষ্ট জায়গায় স্থানান্তর করতে হবে। প্রতি বছর গাছের চাহিদা অনুযায়ী সুষম মাত্রায় সার যেমন পচা গোবর বা জৈব সার, ইউরিয়া, ডিএপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বোরিক এসিড দিতে হবে। সবগুলো সার একবারে প্রয়োগ না করে ৩ থেকে ৪ বারে প্রয়োগ করা ভালো। টবে জৈব সার হিসাবে পচানো খৈল খুবই ভালো ফল প্রদান করে। সার প্রয়োগের পর পানির ব্যবস্থা করতে হবে। যখন বৃষ্টিপাত কম হয় এবং মাটি শুষ্ক অবস্থায় থাকে তখন প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দেয়া প্রয়োজন। গাছ লাগানোর প্রথম দুই বছর গাছে শক্ত খুটির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি ৩/৪ জাতের আম পছন্দ করেন কিন্তু তার একটি টব রাখার জায়গা থাকে। তাহলে উক্ত টবে একটি গাছ রোপণ করে ২/৩ বছর পর তাতে কাঙ্ক্ষিত জাতসমূহের সায়ন দ্বারা টপ ওয়ার্কিং করলে একটি গাছ হতেই কাঙ্ক্ষিত জাতসমূহের আম উৎপাদন করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে একটি গাছে অনেকগুলো জাতের সমাবেশ ঘটানো যায়। টবে জন্মানো গাছের ফলন বাগানে জন্মানো গাছের চেয়ে কিছুটা কম হলেও সন্তোষজনক। আমগাছ আমাদের জাতীয় বৃক্ষ এবং আম সর্বাধিক পছন্দনীয় ফল। সুতরাং আমের চাহিদা পূরণে শুধু বাগানের দিকে চেয়ে থাকার প্রয়োজন নেই, টবে জন্মানো একটি ভালো আমগাছ একটি পরিবারের আমের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

চিত্র: টবে জন্মানো আমগাছ

বরেন্দ্র ও চর অঞ্চলে আমবাগান স্থাপনে সমস্যা ও করণীয়

বর্তমান সময়ে ফল চাষ লাভজনক হওয়ায় সারাদেশে বিভিন্ন ফলের বাণিজ্যিক চাষাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কম সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে ফলবাগান হতে আশানুরূপ মুনাফা পাওয়া যায়। ফলে প্রতি বছর আম, লিচু, কুল, কলা, পেঁপে, লেবু, মাল্টা ও পেয়ারার চাষ ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ফলগুলোর মধ্যে আমবাগান বাড়ছে দ্রুত হারে। ধান চাষে সেচের পানি সমস্যা ও উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় জমির মালিকেরা ঝুকছে আম চাষের দিকে। শুধু তাই নয় বরেন্দ্র অঞ্চলসহ চর এলাকা এবং অন্যান্য এলাকার পতিত জমি আসছে আম চাষের আওতায়। বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চলে হু-হু করে বাড়ছে ফলের বাগান। বরেন্দ্র ও চর অঞ্চলের মাটির গঠন অন্য এলাকার মাটি হতে একটু ভিন্ন ধরনের। বরেন্দ্র অঞ্চলের মাটি লাল বর্ণের ও অনুর্বর প্রকৃতির এবং অল্প বৃষ্টি হলেই মাটি একেবারে নরম হয়ে যায়। ফলে এসব মাটিতে গড়ে উঠা নতুন বাগানে গাছ উপড়ে পরাসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা যাচ্ছে। বাগান করার সময় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করারর ফলে এই ধরনের সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। সঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে অতি সহজেই এসকল সমস্যার সমাধান করে ভালো ও লাভজনক বাগান স্থাপন করা যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, রংপুর এবং দিনাজপুর জেলাব্যাপি বরেন্দ্র ভূমি বিস্তৃত। তার মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নওগাঁ জেলাভূক্ত বরেন্দ্র অঞ্চলে আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই এলাকার মাটি যেমন একটু বৃষ্টিতে ভিজে কর্দমাক্ত হয় তেমনি কয়েকদিন বৃষ্টি না হলে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। ফলে অতিবৃষ্টি ও খরা মৌসুমে চাষিরা পড়েন বিভিন্ন সমস্যায়। কখনও একটানা বৃষ্টিতে বৃহৎ আকারের ফলদ বৃক্ষ শিকড়সহ উপড়ে পরার ঘটনা ঘটে। আবার পানির অভাবে গাছের পাতা শুকিয়ে যায়, ডাই ব্যাক দেখা দেয় এবং সম্পূর্ণ গাছ এক সময় মারা যায়। এ সমস্যার সমাধানে ফল বিজ্ঞানীরা বিশ কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন যা পালনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে সাফল্যের সাথে বিভিন্ন ফল বিশেষ করে আমবাগান স্থাপন করা সম্ভব হবে।

বরেন্দ্র অঞ্চলে আমবাগান স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা

চারা বা কলম রোপণের পূর্বে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতায় ১ × ১ × ১ মিটার গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্ত তৈরির ১০-১৫ দিন পর তৈরিকৃত গর্তের উপরের অংশের মাটির সাথে ২০-৩০ কেজি পচা গোবর/জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম, ২০ গ্রাম জিংক সালফেট এবং ৪০ গ্রাম বোরিক এসিড মিশিয়ে মাটি ওলট-পালট করে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাটের ১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে (৫ সে. মি. গভীরে) একটি পরিপুষ্ট অঙ্কুরিত আমের আঁটি লাগিয়ে তারপর চারিদিকে মাটি দিয়ে সমান্য চেপে দিতে হবে। পরের বছর ঐ আঁটির গাছে কাঙ্খিত জাতের সায়ন দ্বারা ইন-সিটু (*In-situ*) গ্রাফটিং করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রধান মূলটি মাটির অনেক ভিতরে প্রবেশ করে। ফলে খরার সময় মাটির গভীর হতে পানি সংগ্রহ করে এবং গাছকে তুলনামূলক অধিক দৃঢ়তা প্রদান করে। অপরদিকে কলমের গাছের প্রধান মূলটি কেটে ফেলা হয় ফলে গাছগুলো তুলনামূলক দুর্বল হয় এবং সামান্য ঝড়-বৃষ্টিতেই উল্টে যায়। ইন-সিটু পদ্ধতিতে তৈরি বাগানের গাছ তুলনামূলকভাবে খরা এবং ঝড় প্রতিরোধী হয়ে থাকে।

আমের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণ

বর্তমানে দেশের প্রায় ২৩টি জেলায় বাণিজ্যিকভাবে আম উৎপাদন হচ্ছে, যা বিভিন্নভাবে ঢাকাসহ সারাদেশে সরবরাহ হয়। পরিবহন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণসহ নানান কারণে প্রতি বছর উক্ত আমের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ নষ্ট হয়। যথাযথ সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উক্ত আমের একটি বড় অংশ রক্ষা করা সম্ভব। নিম্নে আমের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

আম সংগ্রহ: ফল ধারণের পর আম পরিপক্বতা অর্জনে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে। ব্যবহার বিবেচনায় আমকে দু' অবস্থায় সংগ্রহ করা হয় যেমন: কাঁচা অবস্থায় ও পাকা অবস্থায়। কাঁচা আম বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য তৈরিতে এবং পাকা আম ভক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। পাকা আম পরিপূণ পুষ্টতায় না পৌছানো পর্যন্ত গাছ থেকে পাড়া উচিত নয়। কারণ অপুষ্ট আম ঠিকমত পাকে না এবং স্বাদে টক বা অল্প মিষ্টি হয়। পরিপূর্ণভাবে পুষ্ট (mature) হলে আমের উপরের অংশ অর্থাৎ বোঁটার নিচের ত্বক সামান্য হলুদাভ রঙ ধারণ করে এবং আমের আপেক্ষিক গুরুত্ব হয় ১.০১-১.০২ অর্থাৎ পরিপক্ব আম পানিতে ডুবে যায়। প্রাকৃতিকভাবে দু একটা পাকা আমগাছ থেকে ঝরে পড়লে এবং পাখিতে ঠোঁকরালে আমের পরিপক্বতা নির্দেশ করে। তবে রপ্তানিযোগ্য আম ৮০-৮৫ ভাগ পরিপক্বতায় সংগ্রহ করা ভালো।

আম সংগ্রহের উপযুক্ত সময়: পরিপক্ব আম গাছ থেকে সংগ্রহের অনুমোদিত উপযুক্ত সময় হলো সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত। এ সময়ে আম পাড়লে আমের কষ কম বের হয়। মনে রাখতে হবে, বৃষ্টি হওয়ার পর পরই আম সংগ্রহ করা উচিত নয়।

সতর্কতা

- বেশিরভাগ আমে পরিপক্বতা এলেই গাছ থেকে পাড়তে হবে
- আম এমনভাবে পাড়তে হবে যেন কোন আঘাত না পায়
- আম সংগ্রহের ১০-১৫ দিন পূর্ব থেকে বালাইনাশক স্প্রে বন্ধ করতে হবে
- গাছ থেকে পাড়ার পর আমকে কিছুক্ষণ উপুড় করে রাখতে হবে যাতে আমের আঁঠা ঠিকমত ঝরে পড়ে ও আমের গায়ে না লাগতে পারে
- গাছের তলা থেকে আম দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে
- বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে আম একবারে না পেড়ে দফায় দফায় পাড়া যেতে পারে।

আম সংগ্রহ পদ্ধতি: আমগাছ হতে আমকে দু'ভাবে পাড়া যায় যেমন: হাত দিয়ে এবং ঠুসি বা সংগ্রহকের সাহায্যে। আমগাছের উচ্চতা কম হলে সহজেই হাত দ্বারা পাড়া সম্ভব কিন্তু গাছ বড় হলে বা উচ্চতা বেশি হলে আম সংগ্রহক (mango harvester) বা ঠুসির সাহায্যে গাছ থেকে আম পাড়তে হবে। একটি চিকন লম্বা বাঁশের আগায় নেটের ব্যাগ দিয়ে ঠুসি তৈরি করা হয়। গাছের শাখা থেকে ঠুসির সাহায্যে আম পাড়ার পর সরাসরি ক্রেট বা ঝুড়িতে স্থানান্তর করা যায়। সংগ্রহের সময় ফলের গায়ে যাতে আঘাত না লাগে বা ক্ষত সৃষ্টি না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। জীবাণু সংক্রমণে থেকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং ফল সংগ্রহের পাত্র অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

চিত্র: আম সংগ্রহ পদ্ধতি

গাছ থেকে আম পাড়া এবং বাগানে আম হ্যান্ডলিংয়ের কলাকৌশল

- অনুজীবের অনুপ্রবেশ ও সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য আম পাড়ার আগে শ্রমিকদের হাতমুখ অবশ্যই পরিষ্কার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে
- আমে যাতে কষ না লাগে সে জন্য ৩-৫ সে. মি. বোঁটাসহ আম পাড়তে হবে
- ক্ষত থেকে আমকে রক্ষার জন্য সংগ্রহপাত্রের ভেতরে দিকে পরিষ্কার প্লাস্টিক, চটের বস্তা বা পুরনো খবরের কাগজ বিছিয়ে নিতে হবে
- ছিদ্র, ক্ষতযুক্ত, আঘাতপ্রাপ্ত, রোগাক্রান্ত, পোকাক্রান্ত, বিকৃত প্রভৃতি আম অবশ্যই আলাদা করে নিতে হবে
- আম ভর্তি পাত্র অত্যন্ত যত্নের সাথে মাটিতে রাখতে হবে। কোনো ভাবেই সংগৃহীত আম সরাসরি মাটির উপর ঢালা যাবে না। মাটিতে পাতলা ত্রিপল অথবা মোটা কাপড় বিছিয়ে তার উপর সংগৃহীত আম ঢালতে হবে
- গাছ থেকে আম পাড়ার পর পরই সংগৃহীত আমগুলোকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।

আমের সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম:

নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আমের সংগ্রহোত্তর ধাপসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

চিত্র: বোঁটাসহ আম সংগ্রহ পদ্ধতি

১. বোটা ছাঁটাইকরণ বা ট্রিমিং: আমের বোটা ছাঁটাই বলতে ফলের সাথে লেগে থাকা বোঁটা অপসারণকে বুঝায়। সাধারণত ৩-৫ সে. মি. বোঁটাসহ আম পাড়া হয়। আমের সাথে লেগে থাকা উক্ত বোঁটার ১ সে. মি. রেখে বাড়তি অংশ কেটে ফেলতে হবে।

চিত্র: আমের কষ ঝরানো পদ্ধতি

২. আমের কষ অপসারণ: আম থেকে তাজা কষ বের করে দেয়াকে কষ অপসারণ বলে। এ জন্য একটি পরিষ্কার ধারালো কাঁচি বা সিকেচারের সাহায্যে ফলের বোঁটা আমের কাঁধ বরাবর কেটে ফেলতে হবে। অতঃপর বোঁটা ছাঁটাইয়ের পর আমগুলোকে বিশেষভাবে তৈরি একটি প্লাস্টিক, স্টিল বা বাঁশের মাচা বা তাকের ওপর ৩০ মিনিট উপুর করে রাখতে হবে যাতে কষ ভালোভাবে বের হয়ে যায়। আমের কষ যেন আমের গায়ে না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বোঁটা ছাঁটাইয়ের সাথে সাথে আমগুলোকে ১% ফিটকিরির দ্রবণে (৫০ লিটার পানিতে ৫০০ গ্রাম ফিটকিরি মেশাতে হবে) ১ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। ফিটকিরি আমের কষকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে ক্রেটে ফল ভরে ক্রেটসহ আমকে ফিটকিরির দ্রবণে ডুবিয়ে দেয়া যায়। অতঃপর ১ মিনিট পর ফলগুলো তুলে গায়ের পানি শুকিয়ে নিয়ে প্যাকেট করতে হবে।

৩. সর্টিং বা বাছাইকরণ: সংগৃহীত আম সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বাছাইকরণ অপরিহার্য। আঘাতপ্রাপ্ত, রোগ ও পোকা আক্রান্ত এবং গাছ পাকা আম বাছাই করে আলাদা রাখতে হবে কারণ এসব আম দ্রুত পচে যায়। আম সংগ্রহের পর গুণগতমানের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে হবে। ভালো গুণাগুণসম্পন্ন আম পরিপক্ব, উত্তম আকার বিশিষ্ট, পরিষ্কার, রোগ ও পোকামাকড় মুক্ত এবং যান্ত্রিক ক্ষত মুক্ত হতে হবে। এছাড়া পোকামাকড় (যেমন: ফ্রুট ফ্লাই, ফ্রুট বোরার, থ্রিপস প্রভৃতি) আক্রান্ত আম, রোগ (যেমন: স্ক্যাব, সুটিমোল্ড, এ্যানথ্রাকনোজ প্রভৃতি) আক্রান্ত আম, সংগ্রহকালীন ও হ্যান্ডেলিংজনিত ক্ষত (যেমন: কষের দাগ, থেঁতলানো, ঘর্ষণ, চাপজনিত ক্ষত, কাটা, ছিদ্র) যুক্ত আম এবং অপরিপক্ব আমগুলো বাতিল হিসেবে গণ্য করে আলাদা রাখতে হবে।

৪. গ্রেডিং বা শ্রেণিকরণ: ফলের আকার, আকৃতি ও পরিপক্বতার ধাপ অনুযায়ী আমকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করাকে গ্রেডিং বলে। যে কোন ফল প্যাকিং, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে সুবিধার জন্য প্যাকিং এর পূর্বে ছোট, মাঝারি এবং বড় এই তিন ভাগে ভাগ করা উচিত।

৫. সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে আমের রোগ নিয়ন্ত্রণ: সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে আমের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ হলো এ্যানথ্রাকনোজ ও স্টেম এন্ড রট। সুবজ অবস্থায় আমে এ দুইটি রোগ শনাক্ত করা যায় না। শুধুমাত্র আমে রোগ জীবাণু থাকলেই ফল পাকার পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমের সংগ্রহপূর্ব এবং সংগ্রহোত্তর সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগ দুইটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। রোগ দুইটি দমনের জন্য গরম পানিতে আম শোধন করা সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। গরম পানিতে শোধনের ক্ষেত্রে সবুজ পরিপক্ব আমকে ৫২-৫৫° সে. তাপমাত্রায় জাতভেদে ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে আমে উপস্থিত রোগের জীবাণু মারা যায় কিন্তু ফলের কোনো ক্ষতি হয় না। ৫২° সে. এর নিম্ন তাপমাত্রায় এ পদ্ধতির কার্যকারিতা কমে যায়। আবার ৫৫° সে. এর অধিক তাপমাত্রায় আমের চামড়া ঝলসে যায়। কাজেই সঠিকভাবে আম শোধনের জন্য পানির তাপমাত্রা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বজায় রাখা আবশ্যক। আমকে গরম পানিতে শোধন করলে আমের রঙ কিছুটা হলুদ হয় এবং বেশ কিছুদিন রোগমুক্ত থাকে। গরম পানিতে ট্রিটমেন্ট করলে আমের স্বাদ বেড়ে যায়।

চিত্র: গরম পানিতে আম শোধন

৬. প্যাকিং/প্যাকেজিং: আম সংগ্রহের পর ভোক্তার নিকট পৌছানোর জন্যে যে ব্যবস্থাপনা করা হয় তাকে প্যাকেজিং বলে। পরিবহন ও পরবর্তী হ্যান্ডলিং এর সময় ফলের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য যথাযথ প্যাকেজিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আম দূরবর্তী স্থানে পাঠানোর জন্য প্যাকিং একান্ত প্রয়োজন। কেননা আমের শরীর বেশ নরম এবং সামান্য আঘাতে জখম হতে পারে এবং তাতে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে। দূরবর্তী বাজারে প্রেরণের জন্য স্বাভাবিক, উজ্জ্বল এবং পরিপুষ্ট আম বাছাই করে প্যাকিং করতে হবে। প্যাকেজিং কনটেইনার হিসাবে প্লাস্টিক ক্রেট, বাঁশের ঝুড়ি, কার্টন বা কাঠের বাক্স ব্যবহার করা যায় তবে এদের মধ্যে প্লাস্টিক ক্রেট উত্তম। প্যাকেজিং কনটেইনার প্যাকেটের ভেতরের পণ্যকে পর্যাপ্ত সুরক্ষা দেবে, সহজভাবে হ্যান্ডলিং করা যাবে, ভোক্তার কাছে আকর্ষণীয় হবে। আম প্যাকিং এর সময় প্রতিটি প্যাকেটের তলায় কিছু খড় বিছানো

এবং প্রতিটি আমকে টিসু পেপার বা খবরের কাগজ দ্বারা মুড়িয়ে দেওয়া ভালো। প্রত্যেক প্যাকেটের গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে রাখা উচিত। কনটেইনার হ্যান্ডলিং, উঠানো, সাজানো, পরিবহন এবং নামানোর সময় সতর্কতার অবলম্বন করতে হবে। আম ভর্তি কনটেইনারগুলোকে কোনোভাবেই ওপর থেকে ফেলা যাবে না এবং বসার সিট হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

৭. ক্রেট গুদামজাতকরণ: প্রতিবার ব্যবহারের পর প্লাস্টিকের ক্রেটগুলো সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে পরিষ্কার করে খোলা জায়গায় না রেখে গুদামজাত করতে হবে, যাতে পোকামাকড় বা ইঁদুর এগুলোর ক্ষতি করতে না পারে। এছাড়া রাসায়নিক দ্রব্য ও খামার যন্ত্রপাতি থেকে ক্রেটগুলোকে আলাদা রাখতে হবে। তাছাড়া এতে কোনোভাবেই সার, কীটনাশক বা অন্য কোনো রাসায়নিক দ্রব্য রাখা যাবে না।

৮. পরিবহন: পরিবহনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ফলকে ভালো অবস্থায় গুদাম, বাজার বা ভোক্তার নিকট সরবরাহ করা। সরবরাহ চেইনের বিভিন্ন পয়েন্টে যেমন মাঠ থেকে কালেকশন সেন্টার, কালেকশন সেন্টার থেকে প্যাকহাউস, প্যাকহাউস থেকে পাইকারি বাজার এবং পাইকারি বাজার থেকে খুচরা বাজারে আম পরিবহন করতে হয়। আমাদের দেশে প্রধানত সড়ক পথেই আম পরিবহন করা হয়। তাছাড়া পরিবহনের জন্য রিক্সা, সাইকেল, ভ্যান, নৌকা, ট্রাক, গরুর গাড়ি প্রভৃতিও ব্যবহার করা হয়। ট্রাক থেকে ফল ভর্তি ক্রেট বা প্যাকেট নামানো এবং বাজারের একস্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহনের কাজে চার চাকার হস্তচালিত ট্রলি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি

চিত্র: আম পরিবহন পদ্ধতি

পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে খুবই সুবিধাজনক এবং এতে পণ্যের ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হয়। ফল পরিবহনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে:

- আম ভর্তি কনটেইনারগুলো সাবধানতার সাথে ওঠানামা করাতে হবে
- যানবাহনে আম উঠানো, নামানো ও পরিবহনের সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে ফলের গায়ে বা প্যাকেটে আঘাত না লাগে
- পরিবহনের সময় প্যাকেটগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে মাঝখানে বায়ু চলাচলের জন্য ফাঁকা জায়গা থাকে
- প্রয়োজনে হালকা রঙের ত্রিপল বা কাপড় ব্যবহার করতে হবে, যেগুলো তাপ শোষণ করে না।
- গাড়িতে সাজানো বা স্ট্যাকিং (Stacking) এর সময় স্টেকের নিচের ক্রেটগুলোকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না

- পরিবহনে বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না এতে আম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- পরিবহন শেষে আম প্যাকেট থেকে বের করে গুদামজাত করতে হবে
- গাদাগাদি করে আম পরিবহন করলে নিচের আমে বেশি চাপ পড়ে ও আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৯. গুদামজাতকরণ: গাছ থেকে আম পাড়ার পর বিক্রয় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে আমকে গুদামজাত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফল সংগ্রহ করার পরও তার মধ্যে বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ঘরে বাতাস চলাচল ঠিক রাখতে প্রয়োজনে ইলেকট্রিক ফ্যান ব্যবহার করতে হবে। তাই আম গুদামজাত করার সময় নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

- যে ঘরে আম রাখা হবে তা অবশ্যই খোলামেলা, আলো-বাতাস পূর্ণ ও শীতল হতে হবে। ঘরে বাতাস চলাচল ঠিক রাখতে প্রয়োজনে ইলেকট্রিক ফ্যান ব্যবহার করা যেতে পারে
- আর্দ্র আবহাওয়ায় ও বদ্ধ ঘরে আম তাড়াতাড়ি পাকে এবং সহজে পচন ধরে যায়। তাই পাকা আম বেশি দিন গুদামে সংরক্ষণ না করে তাড়াতাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. বাজারজাতকরণ: যে কোন জিনিস বাজারজাতকরণ একটি সুন্দর আর্ট। দক্ষ ব্যবসায়ীগণ বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন যাতে ক্রেতাসাধারণ অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। আম বাজারজাতকরণের সময় নিম্নলিখিত নিয়ম মেনে চলা উচিত।

চিত্র: স্থানীয় বাজারে আম বিক্রয়

- বেশি পাকা আম আগে বিক্রয় করতে হবে
- আমের ক্রেট বা প্যাকেটগুলো গাড়ি থেকে সাবধানতার সাথে নামাতে হবে যেন কোনো প্রকার যান্ত্রিক ক্ষতি না হয়
- সর্টিং টেবিলের ওপর রেখে ফলগুলো পুনঃবাছাই করতে হবে এবং ক্ষতযুক্ত ফলগুলোকে আলাদা করতে হবে
- বাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্যে রেখে ফলের আকার, আকৃতি, বর্ণ ও পরিপক্বতার ভিত্তিতে আমগুলোকে পুনঃগ্রেডিং করতে হবে
- কোন আমে পচন দেখা মাত্রই আলাদা করে রাখতে হবে কারণ উক্ত আমের জীবাণু অন্য সুস্থ আমকে আক্রমণ করে নষ্ট করে ফেলতে পারে
- বিক্রয়ের জন্য ছোট, মাঝারি ও বড় তিন সাইজে গ্রেডিং করা ভালো
- বাজারজাতকৃত আমের গাদায় প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে রাখতে হবে
- খুচরা বিক্রির সময় আমগুলোকে পরিষ্কার তাক কিংবা পাত্রে রেখে প্রদর্শন করতে হবে
- দিনশেষে অবিক্রিত আমগুলো খোলামেলা, আলো-বাতাস পূর্ণ ও শীতল ঘরে সংরক্ষণ করতে হবে
- অস্থায়ী সংরক্ষণের জন্য ঘরের তাপমাত্রা ২০-২৫° হলে গুণগতমান বজায় রেখে বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায়।

রাইপেনিং চেম্বারে আম পাকানো পদ্ধতি: প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়

আম একটি মৌসুমি ফল। দেশে জন্মানো সকল প্রকার ফলের মধ্যে আমের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। কিন্তু এ দেশে আমের প্রাপ্যতা মাত্র ৪ মাস এবং উক্ত ৪ মাসে অন্যান্য মৌসুমি ফলও বাজারে আসে। বাজারে আগাম আমের চাহিদা ও বিক্রয়মূল্য বেশি থাকায় অনেকে আগাম আম সংগ্রহ করে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে তা পাকিয়ে থাকে।

গাছ থেকে অপরিপক্ব আম পেড়ে ক্ষতিকর রাসায়নিক দিয়ে পাকানোর অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রতি বছর বিপুল পরিমাণে আম ধ্বংস করেন। অভিযোগ রয়েছে, অপরিণত অবস্থায় আম পেড়ে ইথেফোন (Ethephon) নামক রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পাকানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) দাবি করেছে, আম পাকাতে ইথেফোন ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য চরম ঝুঁকির। অপরদিকে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) বলছে, ইথেফোন দিয়ে আম বা অন্য ফল পাকানোয় মোটেই স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই। দুই পক্ষের এমন পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ও অবস্থান ফল পাকাতে রাসায়নিকের ব্যবহার নিয়ে তৈরি করে এক ধরণের জটিলতা। ভোক্তাসাধারণ ফল কিনতে গিয়ে ভোগে নানা শঙ্কায়।

চিত্র: শিবগঞ্জের একাডেমির মোড়ে নির্মিত দেশের প্রথম রাইপেনিং চেম্বার ও কোল্ডস্টোরেজ

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ), বাপা এবং দেশের বিশেষজ্ঞদের মতামতের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিভিন্ন দেশে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ইথিলিন গ্যাস (উচ্চ পিএইচ ও আর্দ্রতায় ইথেফোন যৌগ ভেঙে ইথিলিন গ্যাস তৈরি করে) একটি চেম্বার বা প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে ব্যবহার করে পরিণত কাঁচা ফল পাকানো হয়। এর জন্য বিভিন্ন দেশে ইথিলিন ব্যবহারের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। কিন্তু বাংলাদেশে এ জাতীয় নীতিমালা না থাকায় ফল পাকাতে ইচ্ছামতো ও অবাধে ব্যবহার করা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও ইথেফোন। ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহারের কিছু ক্ষতির কারণ থাকায় সরকারিভাবে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হলেও, ইথেফোন দিয়ে ফল পাকানোর বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার হয়নি। যদিও গ্যাস আকারে ইথিলিন ব্যবহার করে ফল পাকানো সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি প্রক্রিয়া।

বিভিন্ন দেশে ইথিলিন গ্যাসীয় পদ্ধতিতে রাইপেনিং চেম্বারে ব্যবহার করে ফল পাকানো হলেও বাংলাদেশে ফল পাকাতে ইথেফোন ব্যবহার করা হয় স্প্রের মাধ্যমে এবং এই পদ্ধতিকে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি হিসেবে দেখছে বাপা। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের জন্য কৃষিপণ্যে বা খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত রাসায়নিকের উপযুক্ত মাত্রা নির্ধারণ সংক্রান্ত কৃষি মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ফল পাকাতে ইথেফোন ব্যবহারের উপযুক্ততা নির্ণয়, মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিরসন ও স্বাস্থ্যঝুঁকি নির্ধারণের লক্ষ্যে জাতীয় পুষ্টি ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) একটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা পরিচালনা করে। এ গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় ইথোফেনের রেসিডিউ বা অবশিষ্টাংশ নিরূপণে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার মাঠপর্যায় থেকে ফলের নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে ২৫০-১০০০০ পিপিএম ইথোফেন প্রয়োগ ও তার অবশিষ্টাংশের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। ফলাফলে দেখা গেছে টমেটো, আমসহ বিভিন্ন ফলে ইথেফোন প্রয়োগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইথোফেনের অবশিষ্টাংশ যা থাকে তা বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (এফএও) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) এর নির্ধারিত/অনুমোদিত মাত্রা (২ পিপিএম) এর চেয়ে অনেক কম, যা মানবদেহের জন্য নিরাপদ। অর্থাৎ, ইথেফোন প্রয়োগকৃত টমেটো, আম, কলাসহ বিভিন্ন ফল শতভাগ নিরাপদ এবং তা কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকিই তৈরি করে না। রাসায়নিক ব্যবহার করে আম পাকানো বিষয়ে জটিলতা নিরসনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর কারিগরী সহায়তায়, শিবগঞ্জ পৌরসভা ও শিবগঞ্জ ম্যাংগো প্রোডিউসার কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর অর্থায়নে এবং জেলা প্রশাসন, চাপাইনবাবগঞ্জ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে একাডেমির মোড়, শিবগঞ্জে দেশের প্রথম রাইপেনিং চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে। রাইপেনিং চেম্বারে আম পাকালে এতে কোন স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকে না।

রাইপেনিং চেম্বার

ইথিলিন প্রয়োগের সঠিক উপায় ও পদ্ধতি হলো গ্যাসীয় পদ্ধতিতে ইথিলিন প্রয়োগ। আর এ জন্য সারা বিশ্বে স্বীকৃত উপায় হচ্ছে রাইপেনিং চেম্বার তৈরি করে তার মাধ্যমে ইথিলিন গ্যাস প্রয়োগ করে ফল পাকানো। রাইপেনিং চেম্বারে ইথিলিন গ্যাস ব্যবহার করে ৭-১০ দিন পূর্বে আম

পাকানো সম্ভব। পৃথিবীর অনেক দেশে রাইপেনিং চেম্বারে আম পাকানোর পদ্ধতিটি বহুল প্রচলিত হলেও আমাদের দেশে এখনও এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়নি। রাইপেনিং চেম্বার ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে অবশ্যই রাইপেনিং চেম্বারের মূলনীতি বাগান ভালোভাবে জানা এবং তা সঠিকভাবে অনুসরণ করা উচিত।

বিভিন্ন দেশে ফল পাকার জন্য একটি পাকা ঘর ব্যবহার করা হয় যা রাইপেনিং চেম্বার নামে পরিচিত। রাইপেনিং চেম্বার হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একটি ঘরের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও এর ভিতরের ইথিলিন গ্যাসের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফলের সংরক্ষণকাল ও পরিপক্বতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এখানে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফলের পরিপক্বতাকে ধীর বা তরান্বিত করা হয় অপর দিকে এখানে ইথিলিন গ্যাসের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে ফল পাকানো সম্ভব হয়। প্রাথমিকভাবে রাইপেনিং চেম্বার প্রযুক্তি বেশ ব্যয়বহুল হলেও দীর্ঘমেয়াদে ফলাফল বিবেচনায় ফল পাকানো জন্য খুবই উপযোগী।

রাইপেনিং চেম্বার তৈরির জন্য একটি বায়ুরোধী দরজা যুক্ত পাকা ঘর, একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি), একটি ডি হিউমিডিফায়ার, কয়েকটা ফ্যান, পিইউ প্যানেল, ইনসুলেশন পেপার, একটি ইথিলিন জেনারেটর ও ইথিলিন ডিটেক্টর প্রয়োজন। গাছ থেকে পরিপুষ্ট আম সংগ্রহ করে এই ঘরে নিম্ন তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করা হয় এবং বাজারে সরবরাহের পূর্বে উক্ত আমের মধ্যে নির্ধারিত মাত্রায় ইথিলিন গ্যাস প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ইথিলিন গ্যাসীয় আকারে সরবরাহ করা হয় বিধায় এর অবশিষ্টাংশ ফলের গায়ে লেগে থাকে না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্যাস বাতাসে উড়ে যায়, ফলে এই পদ্ধতিতে পাকানো আম নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- আম ৮০-৮৫ % পরিপক্বতায় পৌঁছালে গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে
- আমগুলো প্লাস্টিক ক্রেটে ভর্তি করে রাইপেনিং চেম্বারে রাখতে হবে। ক্রেটগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যেন বায়ু চলাচল করতে পারে
- ইথিলিন গ্যাস জেনারেটর বা অন্য কোন উপায়ে ইথেফোন থেকে ইথিলিন গ্যাস উৎপাদন করতে হবে
- চাহিদানুযায়ী সময় নির্ধারণ করা হয়। যেমন: দ্রুত আম পাকাতে বেশি সময় ধরে রাইপেনিং চেম্বারে রাখার প্রয়োজন হয়। সাধারণত: ১৬ ঘন্টা ও ২৪ ঘণ্টা সময় আমকে রাইপেনিং চেম্বারে রাখা হয়।

সুবিধাসমূহ:

- এ পদ্ধতিতে আমের প্রাপ্যতা একমাস বাড়ানো সম্ভব
- মৌসুমের শুরুতেই বাজারজাতকরণের ফলে অধিক দাম পাওয়া যায়
- আমের স্বাদ ও মিষ্টতা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে
- এতে হরমোন, ফরমালিন ও বিষাক্ত কার্বাইডের ব্যবহার হ্রাস পাবে
- আমের সংরক্ষণকাল বাড়বে
- আমের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমবে
- স্বাস্থ্য ঝুঁকি না থাকায় ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত হবে।

আমের প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা

আম সারা পৃথিবীতেই অতি পছন্দনীয় একটি ফল। এদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এদেশে আমের মৌসুম মাত্র ৩-৪ মাস। ফলে বছরের অন্যান্য সময় চাহিদা থাকলেও ক্রেতা বিক্রেতার কিছুই করার থাকে না ক্রেতা বিক্রেতাদের। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি আম-১১ নামে একটি বারোমাসী আমের জাত উদ্ভাবন করেছে। তবে এ জাতটি ভোক্তাদের কাছে সহজলভ্য হতে আরও বছর কয়েক লাগতে পারে। বর্তমানে সারা বছর এই জনপ্রিয় ফলকে ভোক্তাদের নিকট সহজলভ্য করার অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে প্রক্রিয়াজাতকরণ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমের অনেক প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য উৎপন্ন করে। তারা এই প্রক্রিয়াজাত পণ্যগুলো দেশের চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও রপ্তানি করে। এইভাবে কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় আমের ব্যবহার হয় এবং চাষিরা আমের ন্যায্যমূল্যে পেয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে হাতে গোনা কয়েকটি আমের প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য যেমন আমসত্ত্ব, আমচুর, ম্যাংগোবার, বিভিন্ন আমের আচার, চাটনি এবং ম্যাংগো জুস বা ড্রিংক্স উৎপাদিত হয়। এই পণ্যগুলোর মধ্যে আমের আচার, চাটনি, আমসত্ত্ব, আমচুর বাড়িতে মা-বোনেরা অনেকটা ঘরোয়াভাবে তৈরি করে থাকে। নিম্নে আম প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে তৈরিকৃত পণ্য এবং এদের প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে আলোচনা করা হলো-

আমসত্ত্ব

উপকরণ: পাকা আম ১ কেজি, সরিষার তেল ১০০ মি. লি. এবং চিনি পরিমাণমত।

চিত্র: আমসত্ত্ব

প্রস্তুত প্রণালী: আম ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে তা থেকে রস বের করে নিতে হবে। রস চুলায় জ্বাল দিয়ে কিছুটা ঘন হয়ে আসলে ঠান্ডা করে একটি প্লেটে রসের একটি প্রলেপ দিয়ে তা রোদে শুকাতে হবে। প্রলেপ শুকিয়ে আসলে পুনরায় নতুন প্রলেপ দিতে হবে। এভাবে ৫-৭টি প্রলেপ শুকিয়ে আমসত্ত্ব তৈরি করা হয়। আমসত্ত্ব ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে সুবিধামত সাইজ করে কেটে সংরক্ষণ করতে হবে। প্লেট থেকে আমসত্ত্ব উঠানোর সুবিধার্থে রসের প্রলেপ দেয়ার আগে একটু সরিষার তেল মাখিয়ে নিতে হবে। রোদে শুকানোর সময় এতে যাতে মাছি না বসে ও ধুলোবালি না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। রস জ্বাল না দিয়ে সরাসরি শুকিয়েও আমসত্ত্ব তৈরি করা যায়। আম টক হলে রাসের সাথে কিছুটা চিনি যোগ করতে হয়। আমসত্ত্ব দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে হলে রাসের সাথে ০.০৫% সাইট্রিক এসিড ও ০.১% পটাশিয়াম মেটা-বাইসালফেট যোগ করা যেতে পারে।

আমের মোরব্বা

চিত্র: আমের মোরব্বা

উপকরণ: কাঁচা আম ১ কেজি, চিনি ২ কেজি, এলাচ, দারুচিনি ও তেজপাতা পরিমাণমত।

প্রস্তুত প্রণালী: কাঁচা আমের খোসা ছাড়ানোর পর ফালি ফালি করে কেটে নিয়ে, ফালিগুলো কাঁটা চামচ বা অন্য কোন শলাকা দিয়ে কেচতে হবে। এবার ফালিগুলোকে গরম পানিতে ডুবিয়ে হাত দিয়ে চিপে চিপে টক পানি বের করে ফেলতে হবে। চিনির সিরা তৈরি করে আগুনে জ্বাল দিতে হবে। সিরা ঘন হয়ে আসলে তাতে আমের ফালি গুলো দিয়ে অল্প আঁচে জ্বাল দিতে হবে। সিরা যখন আমের ফালির গায়ে লেগে আসবে তখন জ্বাল বন্ধ করে দিতে হবে। ঠান্ডা হলে পরিষ্কার পাত্রে ভরে সংরক্ষণ করতে হবে। চিনির সিরা তৈরির সময় তাতে এলাচ, দারুচিনি ও তেজপাতা মিশানো যেতে পারে।

আমের জেলি

চিত্র: আমের জেলি

উপকরণ: পাকা আম ২ কেজি, চিনি ৪০০ গ্রাম, পানি ২ লিটার ও লেবুর রস ২ চা চামচ।

প্রস্তুত প্রণালী: আমের খোসা ছাড়িয়ে পাত্রে পানি নিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। আম সিদ্ধ হলে এবং পানি শুকিয়ে অর্ধেক হলে নামাতে হবে। সিদ্ধ আম ভালো করে চটকে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে রস আলাদা করতে হয়। সংগৃহিত রসের সাথে চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে। যখন পাত্র ফেনায় ভরে উঠবে তখন লেবুর রস দিতে হবে। আমের রস ঘন হয়ে আসলে তার এক ফোঁটা পানিতে ফেলে যদি দেখা যায় যে তা বসে যাচ্ছে তখন জ্বাল বন্ধ করে শুকনা বোতলে বা কাঁচের বয়মে ভর্তি করে ঠান্ডা জায়গায় রেখে দিতে হবে। জেলি ঠান্ডা হলে বোতলের মুখ বন্ধ করতে হবে। জেলি তৈরিতে কাঁচা আমও ব্যবহার করা যায়। তবে চিনির পরিমাণ একটু বেশি দিতে হয়। লেবুর রসের পরিবর্তে ভিনেগার বা সাইট্রিক এসিডও ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমের আচার

চিত্র: আমের আচার

কাঁচা আম দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু ও মুখরোচক আচার তৈরি করা হয়। এদের কোনটি ঝাল, কোনটি মিষ্টি, কোনটি গুড় দ্বারা আবার কোনটি চিনি দ্বারা তৈরি। অনেকে আচার তৈরি করে তা বিক্রিও করে থাকেন। নিচে আচার তৈরির ৪টি পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

প্রথম পদ্ধতি:

উপকরণ: পরিপুষ্ট কাঁচা আম ১ কেজি, চিনি ৫০০ গ্রাম, ভিনেগার ১৭৫ মিলি., এলাচ, শুকনা মরিচ এবং লবণ পরিমাণমত।

প্রস্তুত প্রণালী: এটি আচার তৈরির অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রথমে আমের খোসা ছাড়িয়ে সাইজমত কেটে তাতে লবণ মাখিয়ে রোদে শুকাতে হবে। ২/৩ দিন শুকানোর পর একটি পাত্রে কাটা আম নিয়ে তাতে চিনি, ভিনেগার, এলাচ, শুকনা মরিচ যোগ করে কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হবে। ফালিগুলো সিদ্ধ হলে ঠান্ডা করে পরিষ্কার বয়মে ভর্তি করে সংরক্ষণ করতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

উপকরণ: কাঁচা আম ১ কেজি, চিনি ৩৭৫ গ্রাম, মৌরি ৫ গ্রাম, মেথি ৫ গ্রাম, শুকনা মরিচ ৩/৪টি, রসুন ২টি, আদা ২০ গ্রাম, তেজপাতা ২/৩টি, লবণ পরিমাণমত।

চিত্র: আমের আচার

প্রণালী: আমের খোসা ছাড়িয়ে গোল বা লম্বা করে কাটতে হবে। এবং আমের ফালিগুলো কাঁটা চামচ দিয়ে কেচিয়ে ছিদ্র ছিদ্র করতে হবে। তারপর কাটা আম গরম পানিতে সিদ্ধ করে পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। এরপর আমের সাথে চিনি ও অন্যান্য উপাদানগুলো মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে। কিছুক্ষণ জ্বাল দিলে আচার প্রস্তুত হয়ে যাবে। কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে কাঁচের বয়মে সংরক্ষণ করতে হবে।

তৃতীয় পদ্ধতি

উপকরণ: কাঁচা আম ১ কেজি, চিনি ২৫০ গ্রাম, মৌরি ৫ গ্রাম, মেথি ৫ গ্রাম, শুকনা মরিচ ৩/৪টি, রসুন ২টি, আদা ২০ গ্রাম, তেজপাতা, লবণ পরিমাণমত।

চিত্র: আমের আচার

প্রস্তুত প্রণালী: যে কোন বয়সের আম দ্বারা এ আচার বানানো যায়। আম খোসা ছাড়ানোর পর ফালি করে কেটে নিতে হবে। একটি পাত্রে সরিষার তেল নিয়ে জ্বাল দিতে হবে। তেল গরম হলে সেখানে সমগ্র উপকরণ কিছুটা ভেজে নিয়ে তাতে কাটা আম চিনিসহ জ্বাল দিতে হবে। আচার ঘন হয়ে আসলে চুলা থেকে নামাতে হবে। আম বেশি টক হলে চিনির পরিমাণ বাড়াতে হবে। আচার ২/৩ দিন রোদে শুকিয়ে কাঁচের বয়মে সংরক্ষণ করতে হবে।

চতুর্থ পদ্ধতি

চিত্র: আমের আচার

উপকরণ: কাঁচা আম ১ কেজি, পাঁচ ফোঁড়ন ৩০ গ্রাম, সরিষার তেল ২০০ মিলি., সরিষা বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ ১ চা চামচ, আস্তা ধনিয়া ২ চা চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, চিনি, ভিনেগার, লবণ এবং তেল পরিমাণমত।

প্রস্তুত প্রণালী: প্রথমে আম খোসাসহ ফালি করে কেটে ভিনেগার, লবণ ও হলুদ মাখিয়ে ৫/৬ ঘণ্টা রোদে রেখে দিতে হবে। এরপর একটি পাত্রে সরিষার তেল নিয়ে রসুন, পাঁচ ফোঁড়ন, ধনিয়া, সরিষা বাটা, চিনিসহ জ্বাল দিতে হবে। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে তার ভিতর আমের ফালিগুলো দিয়ে ওলট-পালট করে নাড়তে হবে। এরপর ঠান্ডা করে দুই-একদিন রোদে শুকিয়ে কাঁচের বয়মে সংরক্ষণ করতে হবে।

আমের প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা

এদেশে স্থানীয় জাতের আমের অভাব নেই। উৎপাদনও একবারে কম নয়। কিন্তু এর ব্যবহার অনেক কম। আম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আশাবাদ অন্যান্য দেশের মতো আমের প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্ভব হলে আমের ক্ষতি অনেকাংশে কমে আসবে। মোট উৎপাদনের ২০ ভাগ প্রক্রিয়াজাতকরণ করা সম্ভব হলে আমের দাম বাড়বে এবং আম চাষিরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। বর্তমানে যে কোম্পানিগুলো আমের প্রক্রিয়াজাত করছে তার পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি আম সেক্টরে নতুন নতুন উদ্যোক্তাকে তৈরি করতে হবে। চীন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এ সকল পণ্য তৈরী করে সারা বিশ্বের বাজার দখল করে আছে। এ দেশ আমের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহারে বেশ পিছিয়ে আছে। আমচাষি সংগঠনগুলো উদ্যোগী হয়ে আমের বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য যেমন আমের আচার, চাটনী, ম্যাংগোবার, আমসত্ত্ব, ড্রাইড ম্যাংগো স্লাইস ইত্যাদি উৎপাদন করতে পারে।

চিত্র: আমের বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য

এই সমস্ত পণ্যগুলো স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি করে মনোরম প্যাকেটে বাজারজাত করলে সহজেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে স্থান করে নিতে পারবে। গ্রামগঞ্জ ও শহরে অনেক মহিলারা আছেন যারা অত্যন্ত মজাদার পণ্য তৈরি করতে পারেন। এইসব দক্ষ মহিলাদের চিহ্নিত করে তাদের তৈরি পণ্যকে ব্র্যান্ডিং করা যেতে পারে। তাঁদের বাণিজ্যিকীকরণের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। আমের প্রক্রিয়াজাতকরণে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। বিগত কয়েক বছর আমচাষিরা আমের নায্যমূল্য পাচ্ছেন না। এ ছাড়া আমের মৌসুমে ঝড়ে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা ও আধাপাকা আম ঝরে পড়ে। এমতাবস্থায়, কাঁচা ও পাকা আমের প্রক্রিয়াজাতকরণের বিকল্প নেই।

অপর দিকে, আমের বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য তৈরি ও ব্যবহার বাড়ানোর, আমের শিল্পজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টি এবং পরিশেষে আমের ব্র্যান্ডিং চালু করা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা উচিত।

আম রপ্তানির সম্ভাবনা ও করণীয়

মে থেকে আগস্ট মাসে এ দেশে অন্যান্য মৌসুমি ফলের পাশাপাশি উৎপাদিত আমের ৯৫ ভাগ বাজারে আসে। ফলে চাষিরা আমের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। শুধুমাত্র, রপ্তানি বৃদ্ধি পেলেই দেশিয় বাজারে আমের কদর বাড়বে এবং আম চাষিরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বে সপ্তম আম উৎপাদনকারী দেশ। আম উৎপাদনে সপ্তম হলেও রপ্তানির ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বিশ্বের ২৩টি দেশে ১৬২২ মেট্রিক টন আম রপ্তানি করেছে। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত আমের জাতের মধ্যে হিমসাগর, গোপালভোগ, ল্যাংড়া, হাড়িভাংগা, বারি আম-৩, ফজলি, সুরমা ফজলি আম উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, কানাডা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ, ইউকে, ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স, গ্রিস, সুইডেন প্রভৃতি দেশে আম রপ্তানি হয়। বিশেষজ্ঞরা আম রপ্তানিতে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে নিম্নের ২০টি কারণকে চিহ্নিত করেছেন-

- আম রপ্তানির কোন লক্ষ্যমাত্রা না থাকা
- আম রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব
- কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতি অনুসরণ না করা
- উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণ না করা
- রপ্তানিযোগ্য জাতের অপর্যাপ্ততা
- নিরাপদ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ না করা
- নতুন বাজার যাচাই ও সৃষ্টিতে সমন্বিত উদ্যোগের অভাব
- প্রান্তিক বা মাইক্রো লেভেলে যথাযথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকা
- মানসম্পন্ন উপকরণ ও লজিস্টিকের অপ্রতুলতা
- উৎপাদিত আমের সংরক্ষণকাল কম
- উৎপাদিত আমের ট্রেসিবিলিটি না থাকা
- যথাযথভাবে হার্ভেস্টিং, সটিং ও গ্রেডিং না করা
- মানসম্পন্ন কুল ভ্যান, প্যাক হাউজ, রাইপেনিং চেম্বারের অভাব
- আন্তর্জাতিক মানের সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকা
- আম উৎপাদন এলাকায় কোয়ারেন্টাইন ল্যাব না থাকা
- পরিবেশ বান্ধব ও ভারসাম্যপূর্ণ মাটির উর্বরতা ব্যবস্থাপনার অভাব
- কর্মী শ্রমিকের নিরাপত্তা ও অসচেতনতা
- আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি আমের ব্র্যান্ডিং ইমেজ না থাকা
- আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং এর অভাব
- অধিক কার্গো ভাড়া ইত্যাদি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আম রপ্তানিতে আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকতে হলে উপরের সমস্যাগুলোর সমাধান করা প্রয়োজন। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে রপ্তানিযোগ্য আমের উৎপাদন ও রপ্তানির পরিমাণ ভবিষ্যতে কিভাবে সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছানো সম্ভব হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখন জরুরি।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ও প্রকাশনা

হোসেন, এ. কে. এম. এবং আহমেদ, এ. ১৯৯৪. এ মনোগ্রাফ অন ম্যাংগো ভ্যারাইটিজ অফ বাংলাদেশ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর. পৃ. নং ১-১৫৫

শফিকুল, এম. এস. এবং অন্যান্য. ২০১১. আমের নতুন জাতের পরিচিতি, উৎপাদন প্রযুক্তি ও পরিচর্যা. আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ. পৃ. নং ১-৩২

হোসেন, এম. এ. এবং অন্যান্য. ২০১১. ফল উৎপাদন উন্নত কলাকৌশল. উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর. পৃ. নং ১-১৬৩

উদ্দিন, এম. এস. এবং রেজা, এম. এইচ. ২০১৭. ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন পদ্ধতি, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বারি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ. পৃ. নং ১-১৬

উদ্দিন এম. এস. এবং অন্যান্য. ২০১৮. আমের আধুনিক চাষাবাদ ও বিপণন কৌশল, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বারি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ. পৃ. নং ১-৪৭

উদ্দিন, এম. এস. এবং অন্যান্য. ২০১৮. আম উৎপাদন নির্দেশিকা (উত্তম কৃষি পদ্ধতির আলোকে নিরাপদ, বিষমুক্ত ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন কলাকৌশল), জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ. পৃ. নং ১-৫৬

উদ্দিন, এম. এস. ২০১৯. আম উৎপাদন নির্দেশিকা (আম উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি কলাকৌশল). জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ. পৃ. নং -১-৯৬

উদ্দিন, এম. এস. ২০২১. আমের ১০০ জাত, জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ. পৃ. নং ১-১০১

সরকার, বি. সি., ইসলাম, এম. এন., বর্মন, জ. সি., ইসলাম, এম. এম., এবং উদ্দিন, এম. এস. ২০২১. আমের জাত ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি. ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১. পৃ. নং-১-১৯০

Esguerra, E. B., Rolle. R and Rahman, M. A. 2017. Postharvest management of mango for quality and safety assurance. FAO Regional Office for Asia and the Pacific. P. 51.

Uddis, M. S. 2013. Application of Molecular Techniques for the Improvement of Mango Production. A PhD Thesis, Biotechnology Research Institute, Beijing, China. P. 70.